Itihas Anusandhan - 33

Collection of Essays presented at the 34th Annual Conference of Paschimbanga Itihas Samsad held at Women's Studies Centre, Jadavpur University, Kolkata

PEER-REVIEWED VOLUME

ISBN : 978-81-939476-0-9

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি, ২০১৯

কপিরাইট
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক
আশীষ কুমার দাস
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০২০

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

মূল নিবন্ধকারের অভিভাষণ

১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ২০ শতকের প্রথমার্ধে রক্ষণশীলতা ও সংস্কার পন্থা: পারিবারিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে—**রীণা ভাদুড়ী** ১

প্রাচীন ভারত

ভারতের প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের ইতিহাসের কয়েকটি দিক —**মোকাম্মেল এইচ ভূঁইয়া** ১৮

আধুনিক ভারত

বাঙালির পাতে আলু—**মৃণালকুমার বসু** ৩৫

ভারত-বহির্ভূত অন্যান্য দেশ

পাচারকারীদের দুর্বৃত্তায়ন—**পলা ব্যানার্জী** ৪৩

বিভিন্ন বিভাগ সমূহ

প্রাচীন ভারত

গরুড় পুরাণে বর্ণিত নরক ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন—**ঋতুপর্ণ চট্টোপাধ্যায়** ৫৭

ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদ, সামাজিক বিধি স্থাপন, বর্ণজাতি ও সমাজ : প্রসঙ্গ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—**দুর্গা শংকর কোলে** ৬৫

ঋষি পরাশরের লাঙল : স্বরূপ অন্বেষণ—**মো. শাহিনুর রশীদ** ৭৭

মগধের সাম্রাজ্যবাদী রৌপ্য অঙ্ক চিহ্নিত মুদ্রা ভাণ্ডার সমূহ : একটি বিশ্লেষণাত্মক নিরীক্ষণ—**সন্দীপ পান** ৯৪

সার্থ, সার্থবাহ ও রাষ্ট্র : অন্বয় ও অনুষঙ্গ বিচার—**সৌম্য ঘোষ** ১০৪
(রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

পৌরাণিক ভাগবতধর্ম ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত : রাষ্ট্র, ধর্ম ও শিল্পের কথা —**কণাদ সিংহ** ১১৩

সামাজিক প্রেক্ষাপটে কুমারী উপাসনার ধারা—**সুকৃত মুখার্জী** ১১৯

আদি-মধ্য যুগীয় দক্ষিণ বিহারের নায়কগণ : একটি লেখতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (একাদশ থেকে দ্বাদশ শতক)—**সন্তু বর** ১২৬

ইতিহাসে লিঙ্গ নিরপেক্ষতা, নিরপেক্ষ ইতিহাস : নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব উৎখননের আলোকে প্রাচীন ভারতচর্চা—**নিবাবরী ব্যানার্জী** ১৩৪

মধ্যযুগের ভারত

বাংলায় ইসলামের আগমন— ফিরে দেখা—**প্রশান্ত মণ্ডল** ১৪১

বঙ্গদেশে ফকিরি সাধনা— এক ভিন্নমুখী প্রতিবাদী সুর—**শ্রাবণী বিশ্বাস** ১৪৬

বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত—**জিতেশ চন্দ্র রায়** ১৫২

মধ্যযুগের মায়াবী মঙ্গলকোট : একটি পুরাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
—**আসিফ জামাল লস্কর** ১৬৩
(ইন্দ্রাণী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

'প্রকৃতি ও সাম্রাজ্য' : *বাবরনামা*-র নিরিখে ভারতের প্রাকৃতিক ইতিহাস
অনুসন্ধান—**দেবরাজ চক্রবর্ত্তী** ১৭৩

মোগল ঢাকার মসজিদ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা—**মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস** ১৮৪

লোকগাথায় রাজপুতানার ইতিহাস : একটি পর্যালোচনা—**সুতপা সেনগুপ্ত** ১৯২

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
—**মো: মাসুদ আলম** ১৯৯

১৮ শতকের শেষার্ধে মেদিনীপুর : ঔপনিবেশিকতা ও মানচিত্রকরণ
—**মৃণাল প্রধান** ২১৫

জনপদ থেকে শহর : আঠারো শতকের কালনা ও কাটোয়া—**সুব্রত রায়** ২২৩

টিপু সুলতানের হুকুমনামা—**মাধবী রায়** ২২৭

আধুনিক ভারত : আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক

বাঙালি মুসলমান সমাজ কাঠামোর বিবর্তন—**মহঃ মইনুল ইসলাম** ২৩৫

প্রাক্-আধুনিক কলিকাতা সমাজে ইউরোপীয় সম্প্রদায়গত চেতনার উন্মেষ
এবং ব্রিটিশ পরিবারতন্ত্রের সূচনা (১৬৯০-১৮০০)—**অরুণিতা চন্দ্র** ২৪৫

বেনিয়ান থেকে বণিক— প্রসঙ্গ আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতা—**অমৃতা শেঠ** ২৫২

নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ : কলকাতা ও শহরতলিতে ইন্ডিয়ান কন্টাজিয়াস
ডিজিজেস অ্যাক্ট এবং গণিকা সমাজ—**মৃত্যুঞ্জয় দত্ত** ২৫৮

ঔপনিবেশিক যুগে নদীয়া জেলার ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত
ইতিহাস—**তুষার বরণ হালদার** ২৬৭
(ইন্দ্রাণী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

চট্টগ্রামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট—**নুরুল ইসলাম** ২৭৫

দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রানীগঞ্জে কয়লাশিল্পের বিকাশ—**সেখ আলি আব্বাস মামুদ** ২৮২

ঔপনিবেশিক শাসনে খ্রিস্টান ধর্ম ও মেচদের উপর এর প্রভাব—**শান্তনা মোচারী** ২৮৯

ঔপনিবেশিক যুগে বাঁকুড়া জেলার ঋণ ব্যবস্থা—**মৃণাল কান্তি খঁক** ২৯৬
(গৌতম চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় মুসলিম আত্মপরিচিতি নির্মাণ :
একটি পর্যালোচনা—**সাজেদ বিশ্বাস** ৩০৩

আধুনিক নগর ও নাগরিক ইতিহাসচর্চার কিছু দিক : একটি ঐতিহাসিক
বিশ্লেষণ—**অজন্তা বিশ্বাস** ৩০৯

বাস্তুহারা : নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে—**প্রণব বর্মণ** ৩১৮

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের উত্থান ও বিদায়
(১৯৫৩-১৯৭১)—**পলাশ মণ্ডল** ৩২৪

স্থানচ্যুতি ও স্থানান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোড়ামারা দ্বীপের রূপান্তর :
একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা—**অরবিন্দ সরদার** ৩৩২

আধুনিক ভারত : আন্দোলন ও সমাবেশ

জঙ্গলমহলে চুয়াড় বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি—**জয়দেব মণ্ডল** ৩৪১

বাঁকুড়া জেলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও আখড়া—**ঋত্বিক বিশ্বাস** ৩৪৮

স্বাধীনতা আন্দোলনে হুগলি জেলার ছাত্রদের ভূমিকা :
বিংশ শতক—**শুভাশিস চক্রবর্তী** ৩৫৪

অবিভক্ত বাংলার শিক্ষক আন্দোলন : গণ-আন্দোলনে রূপান্তর
(১৯২১-১৯৪৭)—**সৌরভ সরকার** ৩৬৩

গণদেবতার নির্মাণ : চম্পারণের গণপরিসর, গুজব ও গান্ধি—**অরুণাংশ মাইতি** ৩৭০

১৯৪২ সালের বাংলার আগস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তি নায়ক—
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার—**কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়** ৩৭৮

বর্ধমান জেলায় অজয়ের বাঁধ নির্মাণ আন্দোলন ও কৃষক সমিতির মাধ্যমে
কৃষক শ্রেণির সংগঠিত আন্দোলন (১৯৪৩-৪৫) —**কাকলী মুখার্জি** ৩৮৪

দেশনেত্রী লীলা রায় (নাগ) : নোয়াখালির দাঙ্গায় ত্রাণ ও পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের
অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তাঁর অবদান (১৯৪৬-১৯৬৪)
—**পারমিতা ভদ্র (সুর রায়)** ৩৯২

প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন-অবরোধ ও আইন-অমান্য (সেপ্টেম্বর ১৯৬৬)
—**স্বাতী মৈত্র** ৩৯৯

আধুনিক ভারত : আঞ্চলিক

কোচবিহারের কোচ রাজাদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্ক
—**বিশ্বনাথ কুণ্ডু** ৪০৯
(ইন্দ্রাণী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

উনিশ শতকের নদীয়া জেলার রাণাঘাটের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক
বিবর্তনে পালচৌধুরী জমিদারদের অবদান —**তুষার দাস** ৪১৬

খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজ : প্রতিষ্ঠা প্রগতি পরিণতি—**সুখেন্দু দাশ** ৪২৩

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ ও তৎকালীন ব্রাহ্ম আন্দোলন—**পুরঞ্জয় চ্যাটার্জী** ৪৩০

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বরানগর, একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯০৫-১৯৩৪)—**রঞ্জিত মণ্ডল** ৪৪১

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২২-৩৬)—**উৎপল কাঞ্জি** ৪৪৮

ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ (১৯৪৭খ্রি.-১৯৭৭খ্রি.)—**সুলজ বালা** ৪৫৬

আধুনিক ভারত : চিন্তা-চেতনা

বঙ্গীয় মুসলিম সমাজচিন্তায় লোকায়ত ধারা : প্রেক্ষিত ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ —**জাহিদুল ইসলাম সানা** ৪৬৭

মহসীন এনডাওমেন্ট ফান্ড ও উনিশ শতকের মুসলিম রাজনীতি —**রৌসনারা খাতুন** ৪৭৮

ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা বিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগ : বিতর্ক ও ফলাফল—**ইমরান ফিলিপ** ৪৮৪

ঔপনিবেশিক পর্বে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা ও কার্যধারা : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান—**শ্রীমা মাইতি** ৪৯৮

ভারতের ইতিহাস : ভগিনী নিবেদিতার ভাষ্য—**প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী** ৫০৭

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আইন ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮-১৯৮৮)—**যূথিকা বর্মা** ৫১৫
(ধনঞ্জয় দাশ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

সাম্প্রদায়িকতাবাদের আদর্শ, স্বরূপ ও সংঘাতের উৎসানুসন্ধান : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯২০-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)—**তন্ময় মালাকার** ৫২২

সাম্প্রদায়িকতা ও নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ ভারত একটি পর্যালোচনা—**শ্রীমন্তী রায়** ৫২৮

হো চি মিনের ভারত ভ্রমণ—**মলয় পাতলা** ৫৩৬

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ২৪ পরগনার শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে অনন্য স্থপতি বিনোদ বিহারী গায়েন—**মহীতোষ গায়েন** ৫৪৩

সরদার ফজলুল করিম ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে বুদ্ধিজীবী এবং তার দায়বদ্ধতা বিশ্লেষণ—**নিবেদিতা রায়** ৫৫২

আধুনিক ভারত : সাংস্কৃতিক

বাংলায় লোকায়ত ইসলামের ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের অন্বেষণ— মারেফতি লোকসংগীতের একটি পর্যালোচনা—সৌমিত্রকুমার সিন্‌হা ৫৬৩

ইতিহাসের আলোকে বাংলার দুর্গোৎসব : উৎপত্তি ও বিবর্তন—**অর্পিতা বোস** ৫৭১

ঔপনিবেশিক কলকাতায় স্থাপত্য এবং যানবাহনের আন্তঃসম্পর্ক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা—**অর্ঘ্য বসু** ৫৭৯

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ভারতে শিকারের ক্রীড়া ও বিনোদনে উত্তরণ : একটি পর্যালোচনা —**অনন্যা ভট্টাচার্য্য** ৫৮৫

বাংলা লোকগানে উনিশ ও বিশ শতকের প্রতিবাদী চেতনা : এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা—**অনুপ পল্লে** ৫৯২

ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ও আজকের 'সাবেকি বাঙালিয়ানা' —**অরুণিমা রায়চৌধুরী** ৬০২

বাঙালির নেশা—**অনুপম ব্যানার্জী** ৬০৮

বাউল শাহ আবদুল করিমের (১৯১৬-২০০৯) সমাজ চিন্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি—**মোহাম্মদ বশির আহাম্মদ** ৬১৬

রবীন্দ্রসংগীত ও বিষ্ণুপুর ঘরানার সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা —**অচিন্ত্য মণ্ডল** ৬২২

আভিজাত্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদ : দলগত ঐক্য প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইংলিশ ও ভারতীয় ক্রিকেটের তুলনামূলক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা —**দেবাশিস মজুমদার** ৬২৮

বিজ্ঞাপনে বর্তমান সমাজচিত্র—**সোনালী নস্কর** ৬৩৪

আধুনিক ভারত : সাহিত্য-কেন্দ্রিক

বঙ্কিম : কলকাতার বাতায়নে বঙ্গদর্শন—**মালিনী সিদ্ধান্ত** ৬৪১

ইতিহাস ও সাহিত্যে চৌবেড়িয়া ও যমুনা নদী—**দীপংকর বিশ্বাস** ৬৪৮

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনী (উবসাস) ও মফস্‌সলী বিদ্বৎ সমাজ—**শংকর বর্মন** ৬৫৭

শরৎ উপন্যাসে জনস্বাস্থ্যের চিত্র—**সামিমা নাসরিন** ৬৬৭

বহির্ভারতচর্চায় বাংলা পত্রিকা : 'চতুরঙ্গ' কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা —**কস্তুরী মুখোপাধ্যায়** ৬৭৩

ভারতীয় সাহিত্যে সাম্যবাদী প্রভাবে উর্দু সাহিত্যের ভূমিকা : *আঙ্গারে* ও তার উত্তরাধিকার—**কুণাল চট্টোপাধ্যায়** ৬৯৫

আধুনিক ভারত : নারী

বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম পর্ব—**পিয়ালী দত্তচৌধুরী** ৭০৭

নারী জাগরণের অগ্রদূত নবাব ফয়জুন্নেসা—**মোঃ সারোয়ার জাহান** ৭১৪

পথিকৃৎ বাঙালি মহিলা ফোটোগ্রাফারদের সন্ধানে (১৮৪০-১৯৪০) —**দেবযানী বিশ্বাস** ৭২১
(মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

লেডি অবলা বসু (১৮৬৪-১৯৫১) : বিংশ শতাব্দীর এক কর্মপ্রাণার জীবনেতিহাস—**ঐন্দ্রিলা মিত্র** ৭২৯

ঔপনিবেশিক দলিলে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষা : একটি সমীক্ষা (১৯১৫-১৯২৫)—**আবুল কালাম আলি** ৭৩৬

নারী শিক্ষায় ঝাড়গ্রাম—**বিশ্বজিৎ মল্লিক** ৭৪৯

নেতাজির পত্রাবলীতে বাসন্তীদেবী : একটি মূল্যায়ন—**রাণু মিস্ত্রী** ৭৫৭

মণিকুন্তলা সেন ও নিবেদিতা নাগ : বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার যুগ, ও 'ব্যক্তিগত জীবন'—**সোমা মারিক** ৭৬৪

বিপ্লববাদী শান্তিসুধা (১৯০৭-১৯৯২)—**মৌসুমী চন্দ** ৭৭২

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মুখপত্র 'একসাথে' এবং কনক মুখার্জি —**পারমিতা সরকার** ৭৭৯

আধুনিক ভারত : বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ

বাঙালির 'স্বাস্থ্য উদ্ধার' ও 'হাওয়া বদল' : ঔপনিবেশিক বাংলায় চিকিৎসা পর্যটন ও অবসর —**সুমন মুখার্জি** ৭৮৯
(গৌতম চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী ও ম্যালেরিয়া—**নূরমহম্মদ সেখ** ৭৯৮

বাঁকুড়া জেলার বন্যা : প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা (১৮৬০-১৯৫০) —**মুসাদ্দেক হোসেন** ৮০৬

নদীয়া জেলার বন্যা : প্রতিরোধ ও জাতীয়তাবাদ (১৮৭১-১৯৩৮) —**সুজন সরকার** ৮১৪

ঔপনিবেশিক জঙ্গলমহলের বাঁকুড়া ও মানভূমে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসায় মিশনারি—**মৃন্ময় সরকার** ৮১৯

জনকল্যাণে পথে নামা : প্রসঙ্গ উত্তর ২৪ পরগনার বিজ্ঞান ক্লাব —**সুকল্যাণ গাইন** ৮৩১

ভারতের পরিবেশ-জ্ঞাপনের ইতিহাসে ব্রডকাস্টিং মাধ্যমের ভূমিকা : প্রসঙ্গ স্টকহোম-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ব্রডকাস্টিং মাধ্যম —**মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়** ৮৪৫

আরোগ্য নিকেতন : উনিশ শতকের বাংলায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবস্থার সংঘাত, সহাবস্থান ও সমন্বয়—**শিপ্রা সরকার** ৮৫৪

তারকেশ্বরের মন্দির ও পরিবেশ : সেকাল ও একাল—**জয়দীপ ঘোষ** ৮৬৪

জওহরলাল নেহরুর বিজ্ঞান ভাবনা গড়ে ওঠার ইতিহাস—**সুজিত রাজবংশী** ৮৭০

ভারত বহির্ভূত অন্যান্য দেশ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড —**ড. মোসা. ছায়িদা আখতার** ৮৮১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোদের তৎপরতা : প্রসঙ্গ খুলনা অঞ্চল
—**মোহাম্মদ মীর সাইফুদ্দীন খালেদ চৌধুরী** ৮৯৭
(ভারত বহির্ভূত অন্যান্য দেশ বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ)

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, ১৯৭২-১৯৯০—**ড. শামীমা হায়দার** ৯০৮

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারত ও শ্যামদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক
—**ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়** ৯২১

দক্ষিণ আফ্রিকায় বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ইতিহাস (১৮০০-২০১৭) :
একটি পর্যালোচনা—**বকুল শ্রীমানী ও অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়** ৯২৬

বেড়া ভাঙার খেলাঘরে : 'বেল এপকের' (Belle Epoque) সময়ে ইংল্যান্ডের
মহিলা ক্রীড়া সংস্কৃতি (১৮৭১-১৯১৪)—**শুভম মাইতি** ৯৩৪

ড. মিস হেলেন কেলার— এক কালোত্তীর্ণ মহিয়সী নারী—**অসিত কুমার কর** ৯৪৫

স্বাধীনতা ও আধুনিকতা : থাই ইতিহাসে এক রাজার কাহিনি—**সুকন্যা সোম** ৯৫২

অধিবেশনে উপস্থাপিত অন্যান্য নিবন্ধের শিরোনাম ৯৬০

রবীন্দ্রসংগীত ও বিষ্ণুপুর ঘরানার সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

অচিন্ত্য মণ্ডল*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীত জীবন শুরু হয়েছিল তাঁর বাড়ির সমৃদ্ধ সাঙ্গীতিক পরিবেশে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকার গুণী শিল্পীদের আনাগোনা ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল বিষ্ণুপুরের সংগীত শিল্পীরা। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের গান শুনে বড়ো হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রী কণ্ঠ সিংহ, যদুভট্ট প্রমুখ।

রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকেই ব্রাহ্ম সমাজে ধর্মচর্চার সঙ্গে একটি সাংগীতিক ঐতিহ্যও গড়ে উঠেছিল। রামমোহন হিন্দুস্থানী সংগীতের কাঠামোয় বেশ কিছু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ হিন্দিগান ভেঙে ব্রহ্মসংগীত রচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। যদুভট্টের মত নামী সংগীত শিল্পীরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বসবাস করেছেন। এর ফলে একটি বিশুদ্ধ সাংগীতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।[১]

তবে নিয়ম করে গান শেখা যাকে বলে, তা রবীন্দ্রনাথ শেখেননি। 'ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে দহরম-মহরম করা, সে আমাকে দিয়ে কোনোকালেই হল না। আমাদের বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের খুব চর্চা হত সেকথা তোমরা সবাই জানো। অথচ আশ্চর্য, এ বাড়ির ছেলে হয়েও আমি কোনোদিনই ওস্তাদিয়ানার জালে বাঁধা পড়িনি। আড়ালে-আবডালে যেটুকু শিখেছি সেটুকুই আমার শেখা।'[২]

যদুভট্ট বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত সংগীত গুণী। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, '.... অধিকাংশ ওস্তাদই কসরত দেখিয়ে দিগ্‌বিজয় করে বেড়ায়। ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল - কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মত তাল-ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনি বিখ্যাত যদুভট্ট, যাঁর কাছে রাধিকাবাবু কিছু শিখেছিলেন।'[৩] যদুভট্টের গানে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কৈশোরে তাঁর সংস্পর্শে এসে কবি শুনলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার গান এবং খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ সংগীত। তাঁর অনুপম গায়নশৈলী কবিমানসে গভীর রেখাপাত করেছিল।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ (সাউথ সিটি), কলকাতা

এরপর ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে এলেন বিষ্ণুপুরের আর এক প্রখ্যাত শিল্পী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (১৮৬১ মতান্তরে, ১৮৬৩-১৯২৫)। রাধিকাপ্রসার আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংগীত সমাজের সংগীতাচার্য, সেই সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সংগীত শিক্ষক। গীতসন্ন্যাসী দিলীপকুমার রায়ের বিবৃতিতে জানা যায় যে : 'রাধিকাবাবু সারা বাংলায় গোসাঁইজি নামে বিশ্রুত। বিংশশতকে বাংলায় এত নামডাক আর কোন ধ্রুপদীর হয়নি... মুসলমানি-ধ্রুপদ, খাণ্ডারবাণী-ধ্রুপদ, গৌরহারবাণী-ধ্রুপদ, বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ— আরও কত রকমের ধ্রুপদের পুঁজিই যে ছিল তাঁর।...'[৪] পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রাধিকাপ্রসাদের গায়কী ও বিপুল সংগ্রহে মুগ্ধ ছিলেন। ১৮৮৮ বা ১৮৮৯ সালে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন রাধিকাপ্রসাদ। কবির রচিত সংগীতের সংখ্যা তখন পাঁচশোর কাছাকাছি। কবির অসামান্য প্রতিভায় রাধিকাপ্রসাদ মুগ্ধ হয়েছিলেন। অন্যদিকে, রাধিকাপ্রসাদ-এর মতো সংগীত সাধকের সংগীত কবিকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করে। রাধিকাপ্রসার-এর ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী— প্রভৃতি শুনে মুগ্ধ কবির হিন্দুস্থানী রাগসংগীতে আকর্ষণ ও অভিজ্ঞতা বেড়ে গিয়েছিল।[৫] রাধিকাপ্রসাদের সংগীত প্রতিভার প্রতি ঠাকুরবাড়ির সকলের কীরকম শ্রদ্ধা ছিল, গুরুদেবের প্রশস্তিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এক জায়গায় তিনি লিখছেন :

> 'রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রস সঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদের চেয়ে বেশি।'[৬]

১৮৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল 'খামখেয়ালী' সভা। অতুলপ্রসাদ লিখেছেন, '... খামখেয়ালী আসরে বিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী তাঁর উচ্চাঙ্গের তান-লয় মণ্ডিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রতিভা এমন সর্বমুখী যে, গোস্বামী মহাশয়ের উপাদেয় সুরে তিনি গান বাঁধিতেন এবং সে নবরচিত গানগুলি রাধিকাপ্রসাদ 'খামখেয়ালী'-র আসরে গাহিয়া শুনাইতেন। তন্মধ্যে একটি গান মনে আছে... 'মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে, চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে।'[৭]

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রতি বছর হত মাঘোৎসব, বছরের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। উৎসবের প্রধান আকর্ষণ সংগীত। একমাস আগে থেকে শুরু হত গানের প্রস্তুতি। এই উপলক্ষ্যে গান রচনা করতেন রবীন্দ্রনাথ। হিন্দি ভাঙাগানও রচিত হত। মূলগানের সুরে কথা বসানো হলে তা রাধিকাপ্রসাদ বা অন্য গায়ককে শিখিয়ে দিতেন। উৎসবে দলের প্রধান গায়ক ছিলেন রাধিকা গোস্বামী। বাংলা ১৩০৫ থেকে ১৩০৮ সালের (১৮৯৮-১৯০১ খ্রি.) মাঘোৎসবে গীত সংগীতের তালিকা পাওয়া গেছে। মাঘোৎসবে যে সমস্ত হিন্দি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা গান থেকে বাংলা গান রচিত হত সেই

হিন্দি গানগুলি রাধিকাপ্রসাদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন কবি। ১৩১১ সাল পর্যন্ত উভয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় গান রচনার এই ধারা অব্যাহত ছিল। ১৩০৫ সালে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে লেখা কয়েকটি হিন্দি ভাঙা গানের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে, যেমন 'বিমল আনন্দে জাগো রে', 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল', 'দিন ফুরালো হে সংসারী', 'মধুর রূপে বিরাজো', 'চির সখা ছেড়ো না মোরে'। 'বিমল আনন্দে জাগো রে' গানটি রাধিকা গোস্বামী হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস্-এ রেকর্ড করেছিলেন। এছাড়া 'স্বপন যদি ভাঙিলে' এবং 'মোরে বারে বারে ফিরালে', গান দুটিও রেকর্ড করা হয়েছিল।[৮]

'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'নতুন গান বাঁধিবার জন্য বাবাকে উৎসাহিত করেছিলেন আমলাদিদি— চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী।'... তাঁর গান গাহিবার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বাবা তাঁকে রাধিকা গোস্বামীর কাছে হিন্দি গান শিখতে দিলেন। ... আমলাদিদি গাইবেন বলে যে গানগুলি বাঁধা হয়েছিল, তার মধ্যে দু একটি মনে পড়ে। যেমন... 'চির সখা ছেড়ো না মোরে', 'এ পরবাসে রবে কে হায়', ' কে বসিলে আজ হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু...' আমার অনুমান, এই গানগুলির সুর রাধিকাবাবুর কাছ থেকে বাবা নিয়ে এসেছিলেন।[৯]

কবির লেখা ব্রহ্মসংগীতের প্রায় সমস্তই সমাজ-মন্দিরে পরিবেশন করেছেন রাধিকাপ্রসাদ। প্রায় দেড় দশকের অধিককাল ব্রাহ্মসমাজের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। কবিকে অসংখ্য ব্রহ্মসংগীতের উৎসের সন্ধান তিনি দিয়েছিলেন। শিক্ষার্থীদেরকে পরম যত্নে শিখিয়েছেন সেই গান।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ধ্রুপদ সংগীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কবি ধ্রুপদগান সম্পর্কে বলেছেন, "আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করা। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি— একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা, আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে ওজন রক্ষা করা"।[১০] বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ সংগীত রাগরাগিণী, সংগীতের বাণী, ভাব ও রসকে ক্ষুণ্ণ না করেই সহজ সরল গতিতে বহমান থেকেছে। কবি বিষ্ণুপুর ঘরানার গীতপ্রকাশের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বেশ কিছুগানের উল্লেখ করা যেতে পারে, কৌন রূপে বনে হো- যদুভট্ট; জয় প্রবল বেগবতী, — যদুভট্ট, ফুলিবন ঘন মোর আয় বসন্ত রি.. যদুভট্ট, আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্তমে — রঙ্গনাথ (যদুভট্ট), অজ্ঞানতম নিকরে গাঢ় ময়ি পতিতে — রামশংকর প্রভৃতি। এই সব গান এবং অন্যান্য বহু গান থেকে প্রয়োজন মতো সুর ও ভাবধারা আহরণ করে কবি রচনা করেছিলেন ধ্রুপদাঙ্গ সংগীত।[১১]

উত্তর ভারতের বিভিন্ন ঘরানার সাথে বিষ্ণুপুর ঘরানার বেশ কিছু রাগ-রাগিণী ও

তালের পার্থক্য রয়েছে। যেমন উত্তর ভারতের প্রায় সব ঘরানাতেই আশাবরী রাগে শুদ্ধ ঋষভ ব্যবহৃত হয়, বিষ্ণুপুর ঘরানাতে কোমল ঋষভ ব্যবহৃত হয়। পূরবী রাগে সর্বভারতীয় কোমল ধৈবতের ব্যবহার হলেও বিষ্ণুপুর ঘরানাতে শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার হয়। বৃন্দাবনী সারঙ্গ-এ সর্বভারতীয় ভাবে আরোহণে শুদ্ধ নিষাদ এবং অবরোহণে কোমল নিষাদের জায়গায় বিষ্ণুপুর ঘরানাতে শুধুমাত্র শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহার হয়। মেঘ রাগে সর্বভারতীয়ভাবে কেবলমাত্র কোমল নিষাদের ব্যবহার হয় এবং গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত; কিন্তু বিষ্ণুপুর ঘরানাতে অরোহণে পূর্বকালে কেবলমাত্র শুদ্ধ নিষাদ ও অবরোহণে শুদ্ধ গান্ধার ব্যবহার করা হত, পরে আচার্যগণ রাগটির পরিমার্জন করে আরোহনে শুদ্ধ নিষাদ এবং অবরোহণে কোমল নিষাদ এবং শুদ্ধ গান্ধারের ব্যবহার এর প্রচলন করেন। কবিগুলি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেঘ রাগে রচিত ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতে বিষ্ণপুর ঘরানার মেঘ এর চলনকে হুবহু অনুসরণ করেছেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার রামকেলি তীব্র মধ্যম বর্জিত। বসন্ত রাগে সর্বভারতীয়ভাবে পঞ্চম ও কোমল ধৈবতের ব্যবহার হয়, বিষ্ণুপুর ঘরানায় বসন্ত রাগে পঞ্চম বর্জিত এবং শুদ্ধ ধৈবতের ব্যবহার হয়। বিভাষ রাগে অন্যান্য ঘরানাতে ঋষভ ও ধৈবত কোমল এবং তীব্র মধ্যমের ব্যবহার হয় কিন্তু বিষ্ণুপুর ঘরানাতে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়, এবং দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। কাফী রাগে সর্বভারতীয়ভাবে কোমল গান্ধার এবং কোমল নিষাদের ব্যবহার হয়, কিন্তু বিষ্ণুপুর ঘরানাতে দুই গান্ধার এবং দুই নিষাদের ব্যবহার হয়। বিষ্ণুপুর ঘরানার ছায়ানট কোমল নিষাদ বর্জিত, কামোদে কড়ি মধ্যম অস্পৃশ্য ইত্যাদি।[১২]

প্রচলিত সুরবিস্তারের এই পরিবর্তন কবি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, 'মনোমোহন, গহন যামিনী শেষে' গানটিতে আশাবরীতে কোমল ঋষভ এর প্রয়োগ, 'নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে'— এখানে রামকেলি রাগ তীব্র মাধ্যম বর্জিত; 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' বা 'বিরহ মধুর হল আজি'— কোমল নিষাদ যুক্ত বেহাগ; 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা'— শুদ্ধ ধৈবত যুক্ত পূরবী; 'আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ', 'ঘোর দুঃখে জাগিনু'— বিভাষ শুদ্ধ ধৈবত সুরাশ্রিত, 'বিপুল তরঙ্গ রে'— শুদ্ধ ও কোমল নিষাদ যুক্ত ভীমপলশ্রী; 'জয় তব বিচিত্র আনন্দ' গানটিতে বৃন্দাবনী সারঙ্গ কোমল নিষাদ বর্জিত, তীব্র মধ্যম-এর ব্যবহার বর্জন করে কামোদ রাগে 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই' এবং 'অমৃতের সাগরে আমি যাব রে'— ইত্যাদি বহু উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, সর্বভারতীয় রাগরাগিণীর পরিবর্তিত রূপটি কবি তাঁর সৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন।[১৩] উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপুরের রাগরাগিণীর ও তালের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করেছিলেন।

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মৃত্যুর পর প্রকৃত সংগীত গুণীর দরকার অনুভব করছিলেন কবি। তিনি লিখছেন, শান্তিনিকেতনে হিন্দুস্তানী গান শিক্ষা দেবার

প্রয়োজন বোধ করি। নিজেও চেষ্টা করেছি, বন্ধুবান্ধবদেরকেও অনুরোধ জানিয়েছি। স্বয়ং দিলীপ কুমারকেও এ সম্বন্ধে আমার অভাব জ্ঞাপন করেছি। তখনই আবিষ্কার করা গেল, বাংলাদেশে একমাত্র গানের ওস্তাদ আছেন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর। আর যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ তার সমকক্ষ নন এবং অনেকে তাঁরই আত্মীয়। আমি তাঁকেও শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কাজের জন্য পেতে ইচ্ছা করেছিলুম। কিন্তু কলকাতায় তাঁর এত কাজ যে, তাঁকে কলকাতার বাইরে পাওয়া সম্ভব হয়নি। দিলীপকুমার তার চেয়ে যোগ্যতম কোনো ওস্তাদের কথা আমাকে জানাতে পারেনি।... গোপেশ্বর বাবুর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ (বাংলাদেশে) কেউ আছেন কিনা সে কথা বলা কঠিন।'[১৪]

এই সব উক্তি থেকে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কবির কতটা উচ্চ ধারণা ছিল তা অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথের রাগাশ্রয়ী গানের সিংহভাগের স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন বিষ্ণুপুরের দুই মহান দিকপাল সংগীতার্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের 'গীতিলিপি'— ছয় খণ্ডের স্বরলিপিকার ছিলেন। ১৯১০ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে উক্ত গ্রন্থের ছয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের অধিকাংশ গান এবং কবির মোট আড়াইশ থেকে তিনশ গানের স্বরলিপি করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। উল্লেখ্য যে, 'গীতাঞ্জলি'-র অধিকাংশ গানেরই স্বরলিপিকার সুরেন্দ্রনাথ এবং গানগুলি 'গীতলিপি'-র বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ২০১টি রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করা হয়েছিল বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের মাধ্যমে।[১৫]

কবিগুরুর মৃত্যুর বছর পাঁচেক পূর্বে শান্তিনিকেতনে বিষ্ণুপুরের সংগীতাচার্য অশেষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আচার্যের পদে নিয়োগ করেন কবি। ইন্দিরাদেবী মারফত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যয় এর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কনিষ্ঠ পুত্র সতেরো বছরের অশেষচন্দ্র রাগসংগীত শিক্ষাদানের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন। অশেষ চন্দ্রকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন তার নিদর্শন পাওয়া যায় অমিতা সেনকে লেখা তাঁর পত্রে। তিনি লিখছেন, : "আমরা একটি নতুন গান শিক্ষক পেয়েছি— গোপেশ্বরের ভাইপো— বয়সে কাঁচা কিন্তু বিদ্যায় পাক ধরেছে। একবার কোনো ছুটিতে এসে তার গান বাজনা শুনলে হয়ত তোর লোভ হবে। পরীক্ষার প্রতি বীতরাগ হওয়াও অসম্ভব নয়। " মাত্র সতের বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের পদ পাওয়া সংগীত ইতিহাসে নিতান্তই বিরল ঘটনা।[১৬]

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখছেন, "একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, উনিশ শতকে বাংলা গীতিকাব্য সংগীতের প্রচারের প্রথম অবস্থায় বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগীতগুণী তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। সেই সময়ে বিষ্ণুপুরের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ সংগীতগুণীরা রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে বিদ্রুপের পাত্র

হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন বড়ো বড়ো সংগীত সম্মেলনে বিষ্ণুপুরের সংগীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, আচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতেন ও রেকর্ডও করেছেন।... ভারতবর্ষের সংগীত জগতের ইতিহাসে বিষ্ণুপুরের সংগীত গুণীদের এই অবদান স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।”[১৭]

সূত্র নির্দেশ

১. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ২০০৭ পৃ. ৩০।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীতচিন্তা, কলকাতা, ১৪১১ (বাংলা) পৃ. ১১৮।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীতচিন্তা, কলকাতা, ১৪১১ (বাংলা) পৃ. ৭৬।
৪. করুণশশী দে, রবীন্দ্রসংগীত সুষমা, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৫।
৫. মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, সুরের সাধনায় বিষ্ণুপুর, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৪৫।
৬. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত, কলকাতা, ১৪১৫ (বাংলা), পৃ. ৩০।
৭. মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, সুরের সাধনায় বিষ্ণুপুর, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৫১।
৮. মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, সুরের সাধনায় বিষ্ণুপুর, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৫১-৫২।
৯. মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।
১০. মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২।
১১. মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২।
১২. ড. দেবব্রত সিংহ ঠাকুর, রবীন্দ্রসংগীতে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রভাব, কলকাতা, ২০১৭ পৃ. ১১।
১৩. মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।
১৪. ড. দেবব্রত সিংহ ঠাকুর, রবীন্দ্রসংগীতে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রভাব, কলকাতা, ২০১৭ পৃ. ৮।
১৫. মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২।
১৬. ড. দেবব্রত সিংহ ঠাকুর, রবীন্দ্রসংগীতে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রভাব, কলকাতা, ২০১৭ পৃ. ৯।
১৭. ড. দেবব্রত সিংহ ঠাকুর, রবীন্দ্রসংগীতে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রভাব, কলকাতা, ২০১৭ পৃ. ৯।

ইতিহাস অনুসন্ধান

৩৩

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

১৭ জুলাই ২০২১

দেশ

TRACTATUS
SIX CHARACTERS
IN SEARCH OF
AN AUTHOR
হযবরল
TRACTATUS
হযবরল
SIX CHARACTERS
IN SEARCH OF
AN AUTHOR

কে তুমি পড়িছ বসি

SIX CHARACTERS
IN SEARCH OF
AN AUTHOR
হযবরল

দেশ

১ শ্রাবণ ১৪২৮ • ১৭ জুলাই ২০২১ • ৮৮ বর্ষ ১৮ সংখ্যা

সূচিপত্র

প্রচ্ছদকাহিনি

১৬

কে তুমি পড়িছ বসি

শতবর্ষ ব্যক্তির হয়। ঘটনার হয়। বইয়েরও হয়। এবং সেই বইয়ের সঙ্গে হয়তো মিশে থাকে এমন সব ধারণা, যার প্রভাব দশ দশক পেরিয়েও অম্লান থেকে যায়। সেই সব বই ও তাদের পাতায়-পাতায় লিখিত-ভাবিত শব্দ-কল্পনা-তত্ত্বজগৎও আক্ষরিক অর্থেই সময়জয়ী। সুকুমার রায়, লুইজি পিরানদেল্লো এবং লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের তিনটি প্রধানতম রচনা শতবর্ষে পড়েছে। তিন গোত্রের তিন ভাষার তিনটি বইয়ের ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে লিখছেন সুমন গুণ, সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাহুল দাশগুপ্ত।

৩১

প্রবন্ধ

উনিশ শতকে মদ্যপান ও বাঙালির মতিগতি

সুরা সুধা হয়ে এসেছিল বাঙালি জীবনে— ইতিহাস তার সজল সাক্ষী। আধুনিকতা আর মদ্যপান খুঁজে নিয়েছিল একই স্পর্শবিন্দু। ঔপনিবেশিক উনিশ শতক লিখেছিল নৈতিকতার নতুন মানদণ্ড। লিখেছেন রক্তিম সুর।

৭৫

শিল্পসংস্কৃতি

বিধুর যুবরাজ

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম সুপারস্টার দিলীপকুমার। তাঁর অভিনয় জীবন আসলে আধুনিক ভারতীয় সিনেমার প্রায় সমান্তরাল এক পট। যে-কারণে তাঁর বিবিধ ম্যানারিজম, স্টিরিয়োটাইপ সত্ত্বেও তিনি আইকনিক। লিখেছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

প্র ব ন্ধ

উনিশ শতকে মদ্যপান ও বাঙালির মতিগতি

র ক্তি ম সু র

অলংকরণ: দীপঙ্কর ভৌমিক

মদ সম্পর্কে বাঙালির মনোভাব বেশ গোলমেলে, এতটাই যে তার তল পাওয়া কঠিন। অন্যকে মদ্যপ বলে দেগে দিয়ে এবং নিজেকে শুদ্ধাচারী প্রমাণ করে সে খানিকটা শ্লাঘা অনুভব করে। সময় সুযোগে সাহসী হয়ে উঠতেও বাধে না। লকডাউন পর্বে মদের দোকানের সামনে সুদীর্ঘ সারিতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষার ছবি দেখে বা পুলিশের চোখে চোখ রেখে মদ কিনতে যাওয়ার আস্ফালন শুনে কিংবা মদের হোম ডেলিভারির জন্য মাতালের আকুতিতে আমাদের ভ্রু কোঁচকায় না, শুধু পাঁড় মাতালদের নিয়ে মিম বানিয়ে একটু আমোদ পাই। মদ খাওয়া কি আধুনিকতার লক্ষণ? তার বিরুদ্ধাচরণ গোঁড়ামি? অথচ বাঙালি আজও মদ খাওয়া নিয়ে রব তোলে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পাড়ায় মদের দোকান খুললে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনে। এমন প্রশ্নও জাগে যে, মদ্যপানের মতো একটা আদিম অভ্যাসের সঙ্গে আধুনিকতার হাওয়াটা জুড়ল কী করে? উনিশ শতকের দিকে তাকিয়ে এর একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মদ্যপান সম্পর্কে বাঙালি মানসিকতা এখনও বোধহয় কোনও বিন্দুতে থিতু হতে পারেনি। উনিশ শতকের দিকে তাকালে এই দোলাচলের উপক্রমণিকা চোখে পড়ে।

ভদ্রলোক বাঙালির মদ্যপানের গোটা ব্যাপারটাই আসলে বেশ ঘোরালো। কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে মদ্যপ বলে দেগে দেওয়া অনুচিত। কারণ যারা মদ খেত তাদের আর্থ-সামাজিক বা ধর্মীয় পরিচয় হরেকরকম। তাই কে মদ খাবে, কতটা খাবে বা কেউ আদৌ খাবে কিনা তার কোনও বাঁধাধরা ছক নেই। কোনও একটা দলের মধ্যে হয়তো মদ খাওয়ার ঝোঁক বেশি, কিন্তু মদ্যপানের ব্যাপারটা অনেকটাই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের। একই স্থান-কাল-পরিস্থিতিতে থেকে সকলেই যেমন মদ খেত না, আবার একই লোকের সৎসঙ্গে হত স্বর্গবাস আর অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। একইভাবে বদলে যেত মদ্যপের প্রতি মনোভাব। উনিশ শতকে মদ্যপান-সংস্কৃতি এই ভাবে হয়ে উঠেছিল বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয়। শুধু আধুনিকতা-মদ্যপানের সহজ সমীকরণে তাকে বাঁধা অসম্ভব। কে যে কখন কোন যুক্তিতে মদ খাবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন।

এমন নয় যে বাঙালি প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বে মদ ছোঁয়নি। ইউরোপীয়রা আসার আগে প্রায় সব গ্রামেই ছিল একটা শুঁড়িপাড়া। মানুষের মদ্যপানের ইতিহাস প্রাচীন, বাঙালির ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। সুরার এগারো রকম উৎসের সন্ধান দিয়েছেন মনুস্মৃতির বাঙালি টীকাকার কুল্লুক ভট্ট। সরাসরি মদ্যপানের অনুমতি না থাকলেও প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সুরার সামাজিক স্বীকৃতির প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। উত্তেজক পানীয় হিসাবে ঋগ্বেদে সোম আর অথর্ববেদে সুরার উল্লেখ কিংবা প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ফার্সি 'আবকর" এবং আরবি 'আরক' শব্দের ব্যবহার প্রমাণ করে ভারতে মদের উপস্থিতি। মনু তাঁর *সংহিতা*-য় লিখেছেন, শুধুমাত্র মদ্যপানে আসক্তির কারণে কোনও ব্যক্তিকে দোষারোপ করা যায় না। কারণ মদ্যপানের প্রতি মানুষের ঝোঁক স্বাভাবিক ও সহজাত। ব্রাহ্মণদের মদ্যপানের অনুমতি দিতে তাঁর আপত্তির কারণ, ভাত পচিয়ে মদ তৈরি করত নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য মানুষ। তার অর্থ, নিচু জাতের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তৈরি মদ খাওয়া যেতে পারে।

সে যুগেও চলত বেলাগাম পার্টি। লক্ষণ সেনের আমলে লেখা *সদুক্তিকর্ণামৃত* (১১২৭ শকাব্দ)-র একটা শ্লোকে বাংলার এক গ্রামে দেবী কান্তার-দুর্গার পুজো উপলক্ষে যুবক-যুবতীদের উদ্দাম নাচ-গান, সেই সঙ্গে মদ্যপানের কথা বেশ রসিয়ে বলা আছে।[১] এ যুগে যেমন 'ছোলা সেদ্ধ দিয়ে দিশি' অথবা 'কাবাব দিয়ে হুইস্কি' বুঝিয়ে দেয় শ্রেণিপার্থক্য, সে যুগেও মদের সঙ্গে চাট হিসেবে নেওয়া খাবারের রকম দেখে ঠিক করা হত মানুষের শ্রেণি। পতঞ্জলি উদাহরণ দিয়েছেন, নীচ ও বদ লোক পেয়াঁজের চাট দিয়ে মদ খায়।[২] পাল যুগে ছিল মদের অফ আর অন শপ। চর্যাপদের এক গানে আছে মদ্যপানের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থাসহ মদের দোকানের কথা।[৩] মধ্যযুগের টীকাকার সর্বানন্দ তাঁর *টীকাসর্বস্ব* (১১৬০)-তে পানীয়-শালা ও গঞ্জের উল্লেখ করেছেন। পানীয়-শালা হল মদ বিক্রির দোকান আর গঞ্জ হল শুঁড়িখানা, যেখানে মানুষ ভিড় করে মদ্যপানের জন্য।[৪]

মধ্যযুগে এসে বাঙালিকে পানের ধর্মীয় লাইসেন্স দিল তন্ত্রসাধনা। তবু খুঁতখুঁতানি গেল না। বিশুদ্ধ আর্য সংস্কৃতির বাহক না হওয়া সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় বাঙালির মননে প্রভাব ফেলেছিল প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত মিতাচারের বিধি। তাই ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে তন্ত্রশাস্ত্র সুরাকে পুজোপাঠের উপচার করে তুললে শুরু হয় এক দীর্ঘমেয়াদি বিতর্ক। এমনকী, তান্ত্রিক উপাসকদের মধ্যেও তৈরি হয় স্পষ্ট বিভাজন। পশ্বাচার ও কুলাচার নামে পরিচিত দুই পরস্পরবিরোধী ধারার মধ্যে কাজিয়া বাধে মদ নিয়ে। পশ্বাচারিণরা মদ খেত না, অন্যদিকে কুলাচারিণদের কাছে সুরাপান ছিল তান্ত্রিক আচারের অংশ। তবে অপরিমিত পানকে মনে করা হত বিশুদ্ধ তান্ত্রিক উপাসনা থেকে বিচ্যুতি। বাংলায় অধিকাংশ গৃহস্থ নিজেদের আবদ্ধ রেখেছিল পশ্বাচারের কম বিপজ্জনক পথে। এদিকে বৈষ্ণব ধর্মে পান মাত্রই নিন্দনীয়। বাংলায় তন্ত্রসাধনার রমরমা থাকলেও বৈষ্ণব মতাদর্শের প্রভাবে শুদ্ধিকরণও চলল। তবে শুধুমাত্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর নিরিখে সুরাপায়ী বাঙালি চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। আঠারো শতকের সূচনায় শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেনের গানেই পাওয়া গেছে মদ্যপান থেকে বিরত থাকার ঘোষণা: 'সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।' মদ্যপানের বহু প্রমাণ থাকলেও শাক্ত ব্যতীত সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে পানাভ্যাস জনপ্রিয় হয়েছিল কি না বলা কঠিন। বরং ধর্মীয় উৎসবের সময় তারা গঞ্জিকা সেবন করত। শিবায়নে বহুবার গাঁজার প্রসঙ্গ আছে। মঙ্গলকাব্যেও মদের কোনও উল্লেখ নেই। তা হলে কি সুরাপান মঙ্গলকাব্যকে প্রভাবিত করার মতো গণ-সংস্কৃতিতে পরিণত হয়নি? কিন্তু ধর্মমঙ্গলে কালু ডোম ও তার জাতের অন্যান্যদের মদ্যপান নিয়ে একগুচ্ছ বেশ মজাদার গল্প আছে।

সময় যত এগিয়েছে, বাঙালির, বিশেষ করে অভিজাতকুলের, মদ্যপান বেড়েছে। সতেরো শতকের শুরুতে আসা ইউরোপীয় পর্যটক স্কাউটেন দাবি করেছেন, ভারতের অন্যান্য অংশে বাংলার পরিচয় ছিল ব্যাপক সুরাসক্ত অঞ্চল হিসেবে।[৫] *সিয়ার-উল-মুতাখরিন*-এ গুলাম হুসেন লিখছেন, বণিক-পর্যটকদের কাছে মদের আড্ডাগুলো ছিল ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত আলোচনার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। নিজামতের আধিকারিকদের তুষ্ট করতে বিদেশি কোম্পানিগুলো উপহার দিত দুর্লভ এবং মহার্ঘ মদিরা।[৬] আঠারো শতকের মাঝামাঝি হিন্দু রাজাদের মধ্যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্গাপুজোর মতো বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে ছিল মদ্যপানের রেওয়াজ।[৭] পুজোয় মদ খাওয়া, নানা অছিলায় সবান্ধব মদের আসর বসানো, মদের আসরে ব্যাবসায়িক চুক্তি পাকা করা বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীকে দামি মদের বোতল ঘুষ দেওয়া— এ যেন একুশ শতকে ফিরে দেখা। প্রাক-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও নীতি-পুলিশের মতো ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ করে মদ্যপান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেনি। তবু সামগ্রিকভাবে স্ব-আরোপিত পরিমিতিবোধ একেবারে হারিয়ে যায়নি।

এই অবস্থায় নতুন ঔপনিবেশিক শাসন বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটাল মৌলিক পরিবর্তন। তাদের মনে পাশ্চাত্যসভ্যতা সম্পর্কে দেখা দিল একটা বিভ্রম বা মোহ। সুসভ্য পশ্চিমের ধারণায় বিভোর হল উনিশ শতকের দেশীয় সমাজ, বিশেষ করে নতুন ভদ্রলোক শ্রেণি। তারা বাছবিচার না করেই পশ্চিমকে সাগ্রহে আপন করেছিল। মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিল, ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা তাদের জীবনকে করবে আধুনিক, উন্নত। এই অনুরাগ শেষপর্যন্ত পরিণত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিচুতলার কর্মচারীদের অন্ধ অনুকরণে। *ভারত সংস্কারক*-এ (নভেম্বর ১৮৭৫) 'বর্তমান বঙ্গসমাজ' শিরোনামে এক প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল, শাসক জাতির অনুকরণ বাঙালিদের এক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর গুপ্ত এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাবিনোদ দাবি করেছিলেন, এই অনুকরণের মূলে ছিল বাঙালি যুবকদের সরকারি চাকরির জন্য প্রবল আগ্রহ।[৮] অনুকরণের একটা সহজ উপায় ছিল সুরাপানের মতো তথাকথিত পশ্চিমি বিনোদনে মজে যাওয়া। বাঙালি ভদ্রলোকের একটা অংশ ভেসে গেল সুরাবিলাসে। সাহেবদের অপরিমিত পানের দৃষ্টান্ত দূর করল তাদের যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। 'পানদোষ' প্রবন্ধে (*সোমপ্রকাশ* ২৯ অগ্রহায়ণ, ১২৭০ বঙ্গাব্দ) লেখা হয়েছিল, পশ্চিমের সবকিছুর শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে তারা এমন প্রবল উৎসাহের সঙ্গে মদে আসক্ত হয়েছিল যে, মদের কুপ্রভাবের পরোয়া করেনি। অনুকরণ করলেও ইউরোপীয় সুরাসংস্কৃতির অনেক কিছু আবার বাংলায় অমিল। যেমন, রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে বাংলায় গড়ে ওঠেনি কোনও পাব-সংস্কৃতি।

বাংলায় ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির পানে আসক্তি বেড়েছিল নানা কারণে। শুরুতেই সম্পন্ন বাঙালি শাসকশ্রেণির আনুকূল্য পেতে ছিল মরিয়া। তাই প্রভুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে বাঙালি ভুঁইফোঁড় শ্রেণি নানা উপলক্ষে কিংবা উপলক্ষ ছাড়াই মহার্ঘ সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের, সংস্কার ভেঙে পরিবেশন করত হরেকরকম 'নিষিদ্ধ' পানীয়। ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে ইংরেজদের আতিথেয়তা লাভের কথা লিখেছিল *সমাচার দর্পণ* (২২ নভেম্বর ১৮২৩)। রাসলীলা উপলক্ষে রূপলাল মল্লিকের বাড়িতে এসে ইউরোপীয় সাহেবরা মদিরা পান করে যথেষ্ট ফুর্তি করেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর *দুর্গাপূজা*-তে লিখেছেন, দুর্গাপুজো আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয়দের তুষ্ট করা, দেবীকে নয়। এ ব্যাপারে রক্ষণশীলই হোন বা সংস্কারপন্থী, সকলেই সমান দড়। রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেবও ইউরোপীয়দের খুশি করার জন্য দুর্গাপুজোর সময় নিজের বাড়িতে মদ্যপানের ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্য দিকে, গভর্নর জেনারেল এবং অন্যান্য ইংরেজ কর্মকর্তাদের গার্ডেন পার্টিতে আমন্ত্রণ পেত দেশীয় সমাজের কেষ্টবিষ্টুরা।

ইংরেজ আমলে জাতের শাসনের ভয় কিছুটা হলেও কমেছিল। আগে জাতের নিয়ম ভাঙা থেকে শুরু করে পাপাচার, এমনকী অপরাধের

বিচারও করত গ্রামের মাথারা। প্রবল তাদের প্রতাপ। জাতের নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে মদ্যপানের কথা কেউ ভাবতেও পারত না। কিন্তু ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা দেশীয় সমাজের উপর চেপে বসলে কোপ পড়ল এই সব মাথাদের ক্ষমতাতেও। বিশেষ করে শহুরে মানুষ জেনে গেল, ফৌজদারি আইনে শাস্তি দিতে পারে একমাত্র সরকার বাহাদুর।[৯] *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* -য় (শ্রাবণ ১৭৭২ শকাব্দ) 'পানদোষ' শিরোনামে এক নিবন্ধে লেখা হয়, ভারতের পরাধীনতার আগে ধর্মশাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা, শাসকের শাস্তির ভয় এবং প্রকাশ্য মানহানির আশঙ্কায় মদ্যপানে পরিমিতিবোধ বজায় ছিল, কিন্তু ইংরেজরা আসার পর থেকে ধর্মের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। ১৮৮৪ সালে এক্সাইজ় কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে উত্তরপাড়া পৌরসভার সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রায় একই কথা বলেছেন। অভিযোগটা প্রশাসনও মেনেছিল, তবে একটু ঘুরিয়ে। বোর্ড অফ রেভেনিউ তার রিপোর্টে দাবি করেছিল সংস্কার থেকে মুক্তিই মদ খাওয়া বাড়িয়েছে। তার অর্থ, পশ্চিমি শিক্ষা বাঙালিকে সাবালক করেছে। ইংরেজি শিক্ষা, নতুন ধরনের পেশা সব কিছু মিলে চিরাচরিত মূল্যবোধ অনেকটাই পালটেছিল। নৈতিকতার নতুন মানদণ্ড আর মদ্যপানে সেভাবে বাধা দিল না। আগে উঁচু জাতের মানুষ মদের দোকানের মালিক হওয়ার কথা ভাবতেই পারতেন না। কারণ, তা শুধু অসম্মানজনকই ছিল না, এর জন্য জাত খোয়ানোর সম্ভাবনাও ছিল প্রবল। এখন ব্যবসায় প্রচুর লাভ দেখে তারাই জাতের নিষেধাজ্ঞায় তুড়ি মেরে নেমে পড়ল মদ-ব্যবসায়। ধর্মীয় অনুশাসন আর সামাজিক হেনস্থার ভয় বা জড়তা কাটিয়ে প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের মদ্যপানের এলিট এবং অন্ত্যজ সংস্কৃতি পরিণত হল গণ-সংস্কৃতিতে।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তৈরি চাকরির সন্ধানে কিংবা লেখাপড়া করতে গ্রাম বা মফস্সল থেকে মহানগরীতে আসা ভদ্রলোক সন্তানেরা একা বা সদলে আশ্রয় নিত ভাড়াবাড়িতে, যাকে 'বাসা' বলার চল ছিল। সেই পাঁচমিশেলি পরিবেশে সামাজিক নিষেধাজ্ঞার বালাই ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, শনি ও রবিবারে এই বাসা হয়ে উঠত মাতালের ঠেক। উইক-এন্ড পার্টি আর কী! ১৮৫২ সালে কলকাতায় আসার পর রামতনু লাহিড়ী প্রাথমিক সংকোচ কাটিয়ে যোগ দেন রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে মদের আসরে। এই ভদ্রলোকরা ফি-শনিবার শহর থেকে যখন বাড়ি ফিরত তাদের থলিতে অন্যান্য গৃহস্থালির সামগ্রীর সঙ্গে উঁকি মারত মদের বোতল। সে যুগের অনেক প্রহসনেরই বিষয়বস্তু, গ্রাম থেকে কলকাতায় লেখাপড়ার জন্য আসা জমিদার-সন্তান কিংবা চাকরির খোঁজে আসা সাধারণ পরিবারের যুবক, শহুরে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাতাল হয়ে উঠেছে। সরকারি বা রেল কোম্পানির চাকরি মিলত সাধারণত বাড়ি থেকে অনেক দূরে। প্রবাসে অব্যবস্থার মধ্যে পরিবারকে কাছে রাখা সবসময় সম্ভব ছিল না। এসব পাণ্ডববর্জিত জায়গায় সারা দিনের কাজের পর একঘেয়েমি কাটাতে বাবুরা একসঙ্গে মিলে মদ্যপানে চিত্তবিনোদন করত। *দ্য স্টেটসম্যান*-এর সম্পাদকীয়তে (২৬ অক্টোবর, ১৮৮০) লেখা হয়েছিল, সাঁওতাল পরগনায় দেশি মদের বিক্রি বাড়িয়েছিল বাঙালিবাবুরা। আবার বাংলার বাইরে পুরনো শহরগুলোতে পরিবার নিয়ে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে সাধারণভাবে পানাভ্যাস দেখা যেত না। তাই কৃষ্ণবিহারী রায়ের*পশ্চিম প্রহসনে* (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) গজেন্দ্র বলছে, গাঁজায় আসক্ত হলেও মদ্যপানের মতো অভদ্রোচিত নেশার অভ্যাস তার নেই।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (কার্তিক ১৭৭৪ শকাব্দ) লিখেছিল, কলকাতা হল সকল পাপাচারের উৎস, নেশার ব্যামো ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতা থেকে মফস্সলে, গ্রামে।[১০] যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় কলকাতায় ভিড় বাড়ল মফস্বলের মানুষের। কলকাতায় এসে তারা মদ্যপানের মতো শহুরে অভ্যাস রপ্ত করতে শুরু করে। তাদের দেখে প্রভাবিত হল গ্রামের প্রতিবেশীরা। তবু গ্রামে সমাজের ভয়ে লুকোছাপা বেশি, তাই অন্তত প্রথম দিকে পানের বহর কম ছিল। অন্যদের তুলনায় শহুরে মানুষ যে মদের জন্য বেশি খরচ করত তার প্রমাণ মেলে সরকারি নথিতেও। আবগারি রাজস্ব বেশি আদায় হত কলকাতা আর চব্বিশ পরগনা থেকে। বোর্ড অফ রেভেনিউ-র সদস্য, এ. মনি তাঁর কার্যবিবরণীতে লিখেছিলেন, সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ মহানগরের কাছাকাছি জেলাগুলোতে পানাভ্যাস বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। ১৭৯৯ সালে গভর্নর জেনারেল বোর্ড অফ রেভেনিউ-কে চব্বিশ পরগনা জেলার ক্ষেত্রে বিশেষ নজরদারির কথা বলেন, কারণ এই জেলার অবস্থান কলকাতার কাছে। ধীরে ধীরে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, কোন্নগর, টাকি, যশোর, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর ইত্যাদি মফস্সল এলাকায় খুলে গেল অনেক মদের দোকান।

কলকাতা এবং বাঙালিদের সত্যি একটা দুর্নাম ছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের*একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০)-তে নববাবুর বাবা কলকাতায় মদ্যপানের সংস্কৃতিতে ভীত হয়ে বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ সেখানে এই পাপাচার ছিল না। উত্তর ভারতে মাদক হিসেবে কদর ছিল গাঁজার, কিন্তু রেলপথের বিস্তারের সঙ্গে চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মল্লিকরা সেখানে বসবাস শুরু করলে তারাই হয়ে উঠল শুঁড়ি। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর আত্মজীবনীতে এলাহাবাদ ও কানপুরের বাঙালি মদ-বিক্রেতাদের সম্পর্কে লিখেছেন। ফকিরমোহন সেনাপতি *আত্মচরিত*-এ (১৯২৭) লিখেছেন, বালেশ্বরে আসা প্রায় সব বাঙালিই ছিল মদ্যপ। তারা বালেশ্বরের মানুষকে কেবল উচ্চমার্গের সংস্কৃতিই নয়, মদ্যপানের সঙ্গেও পরিচয় করিয়েছিল। তিনি বিশেষ করে আঙুল তুলেছিলেন ব্রাহ্মদের দিকে।

উনিশ শতকে বাঙালি কি পশ্চিমি সংস্কৃতির ছোঁয়া পেয়ে আধুনিক হতে চেয়েছিল? আধুনিক হতে চাওয়ার সঙ্গে সুরাপানের একটা যোগ এখনও আছে, তখনও ছিল। কিন্তু শুধু আধুনিক হতে চেয়েছিল বলেই বাঙালি আকণ্ঠ মদ খেতে শুরু করেছিল, তা নয়। আসলে আধুনিকতারও ছিল অনেক রকম। সেই অনুযায়ী স্থির হয়েছিল একজনের বা একটা গোষ্ঠীর পানের ধরন ও পরিমাণ। আবার এমনও হতে পারে, শুধুমাত্র মদের তৃষ্ণা মেটাতেই উপর-নীচ সব স্তরের বেশির ভাগ ভদ্রলোক ভেক ধরেছিল ছদ্ম-আধুনিকতার। এই সন্দেহ আরও জোরালো হয় যখন দেখা যায়, ভদ্রলোক সমাজের বহু অনাধুনিক মানুষ, এমনকী, টিকিধারী 'ভশ্চায'রাও নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারছেন না মদের আকর্ষণ থেকে। একদিকে গোঁড়া হিঁদুয়ানি মদ্যপানে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয়, অন্য দিকে তান্ত্রিক বাড়িতে বিশেষ উপলক্ষে মাতাল হত গোটা পরিবার।[১১]

নিজেকে আধুনিক প্রমাণ করতে চাওয়া মানুষের সহজাত। কিন্তু তার প্রকাশ ব্যক্তিভেদে, প্রজন্মভেদে আলাদা হতে পারে। মদ্যপানের ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছিল। রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীদের মতো সংস্কারপন্থীরা সুরাপান করতেন শুধুমাত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বাদ পুরোপুরি নিতে। এদিকে রামচন্দ্র দাস ছদ্মনামে এক লেখায় মদ্যপানের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে রামমোহন ব্যবহার করলেন ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন, যা কিনা আবার মদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রক্ষণশীলদের প্রধান অবলম্বন। এ যেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন। তবে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন পরিমিত পানে। এক অনুগামী অপরিমিত মদ্যপান করায় রামমোহন তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ রাখেন দীর্ঘ ছ'মাস। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন মদ্যপানকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গোপন রাখার, এমনকী পরিবারের সদস্যদের থেকেও। রামমোহনের এক ঘনিষ্ঠ অনুগামী নন্দকিশোর বসু ঘরে দরজা বন্ধ করে গোপনে মদ্যপান করতেন। সুরা থাকত দেরাজ-বন্দি। হিন্দু কলেজে পাঠরত তাঁর চরম প্রগতিবাদী পুত্র রাজনারায়ণও তা টের পাননি। পরে তিনি রাজনারায়ণকে অনুমতি দেন সন্ধ্যায় বাড়িতে তাঁর সঙ্গে বসে গ্লাস দুই শেরি পানের। কারণ সবান্ধব রাজনারায়ণের মদ্যপানজনিত হুল্লোড় তিনি পছন্দ করতেন না। সন্দেহাতীত প্রগতিশীলতা। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিক্ষিত এলিট শ্রেণির মধ্যে মদ্যপানের যে-প্রবণতা লক্ষ করা যায় তা পানদোষ, মত্ততা নয়। তাই সমাজে মোটেই

নিন্দনীয় নয়।

পরবর্তী সময়েও জারি ছিল এই প্রবণতা। ঈশ্বর গুপ্ত, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়— উনিশ শতকের পানাসক্ত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের তালিকা দীর্ঘ। সুরা প্রতিভাকে ক্ষুরধার করে বলেই তাঁদের বিশ্বাস। এ নিয়ে তাঁদের বিশেষ রাখঢাকও ছিল না। মদ্যপানের বিরুদ্ধে লেখার জন্য *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তকে উপহাস করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। কাশীতে বুরুয়ামঙ্গল উৎসবের সময় অমৃতলাল বসু এবং নবীনচন্দ্র সেনের নেশাচ্ছন্ন আনন্দের মুহূর্তগুলো অমৃতলাল ধরে রেখেছেন 'অমৃতমদিরা' কবিতায়। 'ভদ্রলোক হইলে মদ্যপান করা উচিত এ ধারণা আমাদের মজ্জাগত', অমৃতলালের এই মন্তব্যে খানিকটা নিন্দা থাকলেও তিনি পরিমিত পানের উপকারিতায় বিশ্বাস করতেন।[১২] পশ্চিমি চিকিৎসা শাস্ত্রে মদের ওষধি গুণের যুক্তিও মাত করেছিল শিক্ষিত ভদ্রলোককে। প্রিয়শঙ্কর ঘোষের *সুরাপান কি ভয়ংকর* (১৮৬৪)-এ মেনে নেওয়া হয়েছে, সময় মেনে পরিমিতি বজায় রেখে ওষুধ হিসেবে মদ্যপান পাপ নয়।

অন্যদিকে ইয়ংবেঙ্গলীয়দের নেতৃত্বে প্রগতিশীলরা মদ্যপানকে মনে করেছিলেন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মস্ত হাতিয়ার, সভ্যতার সোচ্চার প্রকাশ। আধুনিক মুক্তমনা পরিচয় জাহির করতে তারা সর্বসমক্ষে নিষিদ্ধ খাদ্য সহযোগে মদের ফোয়ারা ছোটাল। ভদ্রলোক সমাজ হারাল পরিমিতিবোধ। আগে মদ খেলে জাত যেত। এদের যায় না খেলে, সহ্য করতে হয় ইয়ারদোস্তদের টিটকিরি। মদ খেতে রাজি না হওয়ায় বন্ধুরা কীভাবে তাঁকে নাজেহাল করেছিল, তার বর্ণনা প্যারীচরণ সরকার দিয়েছেন *দ্য ট্রি অফ ইনটেম্পারেন্স*-এ। আত্মজীবনীতে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় করেছেন পানের প্রশস্তি। মদ্যপানের ব্যাপারে সুনাম বা দুর্নাম জুড়ে গেল হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, প্রসন্নকুমার সেন, নন্দলাল মিত্র এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজের কাছে গোলদিঘিতে বসে মুসলমানের তৈরি মাংস সহযোগে পান করতেন খাঁটি ব্র্যান্ডি। কীভাবে আকণ্ঠ পান করে বেহেড হতেন তার বর্ণনা রাজনারায়ণ দিয়েছেন *আত্মচরিত*-এ। রামমোহনের নাতি হরিমোহনও ভিড়েছিলেন এই দলে। দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী*-তে মধুসূদন দত্তের ছায়া মেখে নিমচাঁদ যেন এদেরই প্রতিনিধি। এই আচরণ কিন্তু শুধু প্রতিবাদ বা সংস্কারমুক্তি নয়, অহংকার ও আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ, অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা করার প্রচেষ্টা।

এই শিক্ষিত গোষ্ঠীর বিশৃঙ্খল প্রবৃত্তি,

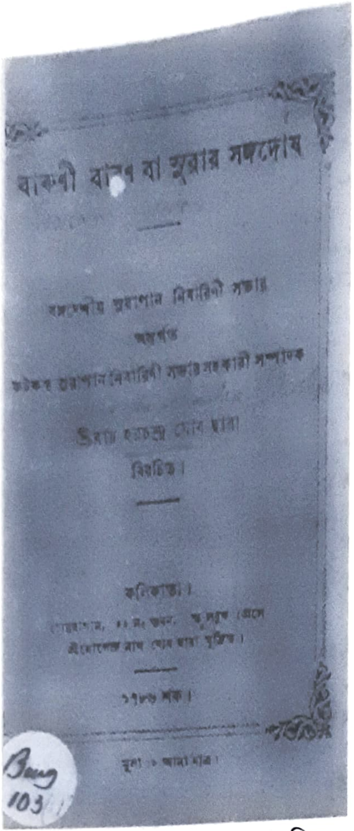

নেশার ব্যামো ছাড়ানোর জন্য সামাজিক উদ্যোগ নিতান্ত কম ছিল না

অসংযত, অবাধ মুক্ত জীবন আকর্ষণ করেছিল বাঙালি সমাজের প্রায় একটা পুরো প্রজন্ম। পাগড়ি, মোজা, প্যান্ট, আলবার্ট ফ্যাশনে চুলের ছাঁট, চশমা এবং মদ্যপানে মুনশিয়ানা ছিল সে যুগে কেতা দেখানোর দস্তুর। এরা মদ খেয়ে ভাঙা-ইংরেজিতে কথা বলত। রপ্ত করেছিল সব ধরনের অভব্যতা। কোনও 'ওল্ড ফুল' আপত্তি জানালেই তাদের বুলি ছিল 'গো টু হেল', যা উনিশ শতকের প্রহসনে মাতালের অবধারিত সংলাপ। মদ ছাড়া বন্ধুদের আড্ডা জমত না। ছুটির দিনে বেড়ে যেত মদ্যপানের বহর।[১৩] এই আধুনিকতা বেশির ভাগ সময় বহিরঙ্গে আটকে থাকলেও আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেত বেশ। *তত্ত্ববোধিনী* (শ্রাবণ, ১৭৭২ শকাব্দ) লিখেছিল, 'বিদ্বান বর্গের দ্বারা মদ্যের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইয়া এবং ধনীর দ্বারা তা সম্মানে গৃহীত হইয়া তদীয় সদৃশ দোষ সত্ত্বেও সাধারণের আদরনীয় হইয়াছে।'

ভদ্রলোকের বৃত্তটা বেশ বড়, তার অনেক শ্রেণি। উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির উপর মহলে মদ্যপান হয়ে উঠেছিল আমোদ-ফুর্তির বিষয়, যা হয়তো সামাজিকভাবে কিছুটা বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক নীচের স্তরের কাছেও, কিন্তু তা শুধু বিশুদ্ধ আমোদের বা মেকি আধুনিকতা দেখানোর জন্য নয়। গ্রাম থেকে মহানগরে এসে এরা মুখোমুখি হয়েছিল এক গভীর মানসিক সংকটের। টিকে থাকার কঠিন লড়াইয়ে যুঝতে তাদের প্রয়োজন ছিল মদের মতো সুলভ বিনোদনের। মদ খেয়ে তারা ভুলতে চেয়েছিল প্রতিদিনের যাতনা। দেখতে চেয়েছিল অলীক স্বপ্ন। *সুলভ সমাচার* (৩ ফাল্গুন ১২৭৭ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে একজন দোকানদার লেখেন, তিনি জানেন যে মদ খাওয়া খারাপ, কিন্তু তাঁর কোনও উপায় নেই।

মদকে ঘিরে উনিশ শতকে বাঙালি জীবনে দেখা দিয়েছিল নানা বিতর্ক। লড়াইটা ছিল ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, পুরাতন ও নতুন ধারণার মধ্যে। মনে করা হত, দুই প্রজন্মের জীবনদর্শন সম্পূর্ণ আলাদা। পুরনো প্রজন্ম ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে আগ্রহী ছিল, কিন্তু নতুন প্রজন্ম বিশ্বাস করত সংক্ষিপ্ত জীবনের পূর্ণ উপভোগে। এই সঞ্চয় সবসময় অর্থ না হয়ে পুণ্যও হতে পারে। তাই মদ্যপানের মতো 'পাশ্চাত্যের' পাপাচারে তারা উদ্বিগ্ন। জোর দিয়েছিল সংযমে। অন্যদিকে আধুনিক জীবনের নানা প্রলোভন নবীনদের করেছিল বেপরোয়া। *আচার* (১৮৯৬) পুস্তিকায় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দাবি ছিল, পুরনো প্রজন্ম ওষুধ হিসাবেও ব্র্যান্ডি পান করতে রাজি ছিল না। এ নিয়ে উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল সমসাময়িক পত্রপত্রিকার নিবন্ধেও। ১৮৭৭ সালের ১৭ মার্চ ঢাকার *হিন্দু হিতৈষী*-তে প্রকাশিত দীর্ঘ নিবন্ধের মুল বক্তব্য হল, ইংরেজদের আসার ঠিক পরে এ দেশে খুব বেশি হলে দু'-একজন মদ্যপান করত। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে যায়। মদ সম্পর্কে প্রাচীন মানুষের সংস্কারের মাত্রা বোঝাতে এই নিবন্ধে ছিল নবাবপুরের এক ধনী ব্যক্তির গল্প। ডাক্তার পায়ে ব্র্যান্ডি মালিশের পরামর্শ দিলে তিনি অনেক দ্বিধার পর রাজি হন। কিন্তু মদ স্পর্শ করেছেন, তাই মালিশের পরে ব্যবস্থা করেন এক বিস্তৃত শোধনপ্রক্রিয়ার।

তবে পুরনো ধ্যানধারণার মানুষের যে কোনও নেশা ছিল না, তা নয়। তারা সেবন করত আফিম-গাঁজা-চরস। অনেকে নতুন নেশা মদে আসক্ত হলেও ছাড়তে পারেনি গাঁজার আসক্তি। বিশুদ্ধ গঞ্জিকাসেবীদের আবার মদের প্রতি ছিল তীব্র বিদ্বেষ। মদ্যপান-সংস্কৃতির চল এনেছিলেন বলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিন্দা করে গান বাঁধেন গাঁজার আড্ডার নেতা রূপচাঁদ পক্ষী। তাঁর কাছে মাতালরা সমাজের হাসির খোরাক। দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে শিবচন্দ্র নতুন প্রজন্মের সস্তা মদ খাওয়ার সংস্কৃতিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। দামি খাবার সহযোগে ধীরে সুস্থে নেশা হওয়াই ছিল গঞ্জিকার বনেদিয়ানা। অন্যদিকে, মদ্যপান গঞ্জিকা সেবনের তুলনায় আধুনিক নেশা, তাই মন কেড়েছিল নবীন প্রজন্মের। তা ছাড়া, দ্রুত নেশা হওয়াও মদ খাওয়ার আর-এক আকর্ষণ। মধ্যবিত্ত পরিবারের অল্পবয়স্করা গঞ্জিকা সেবনের নিন্দে করত। বর্ধমান মহারাজের সভাকবি মদ্যপ ধীরাজ গান বেঁধেছিলেন, 'মধুপান

আর করো না,/ ইয়ংবেঙ্গল বাঁচবে না।/...কিন্তু ড্যাঙ্গা পথে নেইকো মানা।'[১৪] 'ড্যাঙ্গা' এখানে গাঁজা। উনিশ শতকে মদ্যপ ও গঞ্জিকাসেবীদের মধ্যে ছিল এক ধরনের শ্রেণি বিভাজন, কৃষ্টিগত রেষারেষি।

মনে হতে পারে, মদ্যপান নিয়ে উনিশ শতকে একটা আড়াআড়ি বিভাজন হয়ে গিয়েছিল। একদলের কাছে মদ আর আধুনিকতা ছিল অবিচ্ছেদ্য। রেল, বরফ, কলের জল, কডলিভার তেল ও 'ইংরেজি' খাবারের মতো মদও অভদ্র চলনের অংশ। অনেকের বক্তব্য ছিল, ঔপনিবেশিক শাসন কলির সূচনা বা চূড়ান্ত পর্যায়।[১৫] কলি এখানে পাশ্চাত্য-আধুনিকতার প্রতীক, যা নষ্ট করবে দেশীয় ঐতিহ্যকে। রক্ষণশীলরা এমন ভাবতেই পারেন। কিন্তু রক্ষণশীল না হয়েও শশীপদ ব্যানার্জি, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা রাজনারায়ণ বসুর মতো এককালের আগুনখেকো প্রগতিশীলরাও মত্ততার জন্য পশ্চিমি শিক্ষাকেই দায়ী করলেন। সাহেবদের পাল্লায় পড়েই গোল্লায় গেছে বাঙালি। *সোমপ্রকাশ*, *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা বা *হিন্দু প্যাট্রিয়ট*-এর মতো সমসাময়িক পত্রপত্রিকার বক্তব্যও মোটামুটি একই ধরনের। ১৮৭০-৭১ সালের আবগারি প্রতিবেদন উল্লেখ করে প্যারীচরণ সরকার এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রমাণের চেষ্টা করেন, প্রাচীন সংস্কার ও রীতিনীতির প্রতি আনুগত্যই শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির তুলনায় নিচু জাতের বাড়তি সংযমের কারণ। ভাবনায় বিপরীত মেরুতে থাকা রক্ষণশীল আর সংস্কারপন্থীদের বক্তব্য এভাবে মিলে যাওয়ার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে। নানাভাবে রক্ষণশীলদের তখন অস্তিত্বের সঙ্কট। তাদের প্রমাণ করতেই হবে প্রাচীন ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। বলতেই হবে, কী দিন আছিল! অন্য দিকে, সংস্কারকরাও বুঝেছিলেন সমাজে সংস্কারের চেতনা জাগাতে হলে সমস্ত মন্দের জন্য পশ্চিমি ঔপনিবেশিকতাকে দায়ী করে তৈরি করতে হবে দেশীয় ঐতিহ্যের পালটা ন্যারেটিভ।

শিক্ষিত এলিটদের থেকেই আবার উঠে এসেছিল পালটা বক্তব্য। রাজেন্দ্রলাল মিত্র *স্পিরিচুয়াস ড্রিঙ্কস ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া*-তে দেখিয়েছেন, প্রাচীন ভারতে সামাজিক ও ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মদ্যপানে কোনও বাধা পড়েনি। 'হিন্দু আচার ব্যবহার, দ্বিতীয় ভাগ— সামাজিক' শীর্ষক নিবন্ধে হিন্দুদের পানাভ্যাসের উল্লেখ করেছেন মনমোহন বসু। শিক্ষিত বাঙালির বিমুক্ত মন প্রথমে ইউরোপীয় সমাজের মতো নৈতিকতার তালিম পায়নি, তাই হারিয়েছিল সংযম। যারা ইংরেজ সমাজকে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা মিতাচারের দৃষ্টান্ত রেখেছেন - এক্সাইজ় কমিশনে (১৮৮৪) সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এমন বক্তব্য রেখেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্রও পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে মদ্যপানকে জুড়তে চাননি। সরকারি কর্মচারী বলে কি ভয় পেয়েছিলেন শাসকের বিরাগভাজনের! তাই মদ খাওয়াকে নিচুজাতের কালচার বলে তাঁরা চেষ্টা করেন ভদ্রলোক সমাজে মদের প্রভাব লঘু করে দেখাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা সম্পর্কে একটা খটকা অবশ্য থেকে যায়। *নিশীথ রাত্রির কাহিনী* নামে এক অসমাপ্ত গল্পে তিনি মদ্যপানসহ পাশ্চাত্য জীবনশৈলী সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি, অথচ 'বাবু' প্রবন্ধে মদ্যপ বাবুদের বিদ্রুপ করেছিলেন।

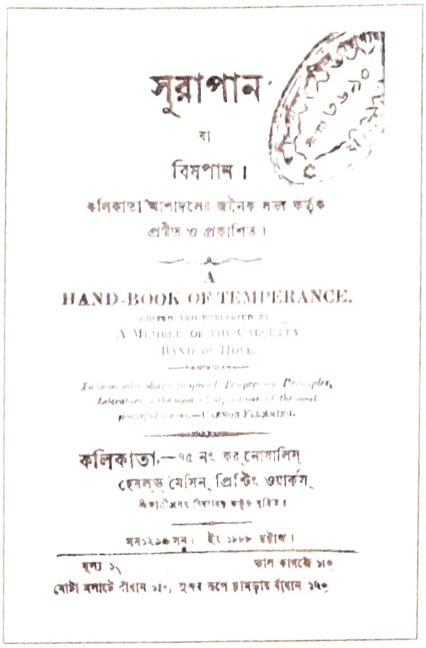
সুরাপান
বা
বিষপান।
কলিকাতা আশাদলের জনৈক সভ্য কর্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

A
HAND-BOOK OF TEMPERANCE.
EDITED AND PUBLISHED BY
A MEMBER OF THE CALCUTTA
BAND OF HOPE.

কলিকাতা।—৭৫ নং কর্ণওয়ালিস্
হেরল্ড মেসিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সন ১২৯৫ সন। ইং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ।

মূল্য ১/

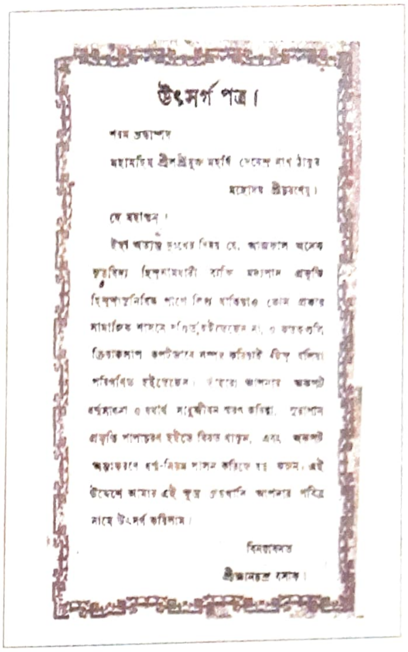
উৎসর্গ পত্র।
পরম শ্রদ্ধাস্পদ
মহামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর
মহোদয় শ্রীচরণেষু।
হে মহাত্মন!

মদ্যপান নিবারণের উদ্দেশ্যে লেখা পুস্তিকা, উৎসর্গ করা হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

লড়াইটা কিন্তু আর রক্ষণশীলতা-প্রগতিশীলতা বা ঐতিহ্য-আধুনিকতার মধ্যে থাকছে না। পরিমিত পানের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেও ঈশ্বর গুপ্ত তো আদতে রক্ষণশীল। রাধাকান্ত দেবের পুত্র ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেববাহাদুর ছিলেন একজন সুপরিচিত মাতাল। অটুট ছিল মদ্যপানের দেশীয় সংস্কৃতিও। মানুষ মদ খেত তন্ত্রের নামে। লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষে মদ খেয়ে ছেলেদের হুজ্জুতির কথা লিখেছেন মনমোহন বসু।[১৬] তীর্থযাত্রাও আসলে ছিল মদ খাওয়ার হুজুক। শ্রীরামপুরের মাহেশে দ্বাদশ গোপাল উৎসবে আসা বাবুদের মাতলামো, বেলেল্লাপনার জন্য জেলযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায় দীনবন্ধু মিত্র (*ভোলারে ভুলো না মাতা এই ভিক্ষা চায়*) ও রাজকৃষ্ণ রায়ের (*দ্বাদশ গোপাল*) প্রহসনে। রাসের মেলা, দুর্গাপুজো ইত্যাদি বারোয়ারি উৎসব উপলক্ষে মদের আসর বসাতে প্রয়োজন ছিল না পাশ্চাত্যের অনুপ্রেরণার। পানের মওকা পেলে মফস্‌সলের বারোয়ারি পুজোতে মেতে উঠত এলাকার ব্রাহ্মরাও। শুধুমাত্র ব্রাহ্মরা নয়, মত্ত অবস্থায় শোভাযাত্রা বের করত হিন্দুসভার সদস্যরাও, *কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র*-এ বলেছেন মন্মথনাথ ঘোষ। নেশাটাই মুখ্য, তাই রক্ষণশীল, প্রগতিশীল, ব্রাহ্ম, ইয়ংবেঙ্গলীয় সব মিলেমিশে একাকার। নেশার ক্ষেত্রে কোনও মতাদর্শের অনুপ্রেরণাও নেই, নেই বাধাও। গোটাটাই নিয়ন্ত্রণ করত ব্যক্তিগত অভিরুচি বা স্খলন।

মদ সবাই খেলেও সকলের রুচি ও পানের ধরন এক নয়। ব্র্যান্ড দিয়ে মাপা হত বাবুর মান, ঠাটবাট। সমাজের উঁচু তলার প্রথম পছন্দ শ্যাম্পেন আর ব্র্যান্ডি। কলকাতা ও অন্যান্য জনবহুল অঞ্চলে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্র্যান্ডি খাওয়ার চল দ্রুত বেড়েছিল।[১৭] উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত হুইস্কি বিশেষ পছন্দের ছিল না।[১৮] দামি মদ কেনার সামর্থ্য না থাকলে মান বাঁচাতে সস্তা বিলাতি মদ চলতে পারে, কিন্তু দেশি মদ ভদ্রলোক খাবে না। চাষাভুষোরাই তার খদ্দের। পানসংস্কৃতিতে এসেছিল শ্রেণিবিভাজন। দেশি মদ খাবে খেটে খাওয়া লোকেরা আর বিলাতি মদের সমঝদার বাবুরা, যারা বুদ্ধি বেচে খায়। তবে পয়সায় টান পড়লে বা অসময়ে রাতবিরেতে দেশিই ছিল ভদ্রলোকের ভরসা। দোকানের সামনের দরজা দিয়ে মদ কিনত ছোটলোকেরা, বাবুদের জন্য ছিল পিছনের দরজা দিয়ে অবাধ প্রবেশ। শুধু কাপড়ে মুখটা ঢেকে নিলেই হল। ছোটলোক-ভদ্রলোক প্রায় এক সারিতেই দাঁড়িয়ে গেল। তা ভদ্রলোকের সঙ্কোচ-অস্বস্তি দূর করতে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা ছিল বইকি! 'হরিবোল', 'হাতড়ি' ইত্যাদি অদ্ভুত সাংকেতিক নামে ফেরিওয়ালারা গভীর রাত পর্যন্ত মদ ফেরি করত। মান খোয়ানোর ভয়ে যারা প্রকাশ্যে মদের দোকানে ঢুকতে পারতেন না তাদের জন্য ছিল ডিসপেনসারি। আবগারি আইন

এড়িয়ে ওষুধের দোকান মদ বিক্রিতে পাল্লা দিত শুঁড়িখানার সঙ্গে। ১৮৭৬ সালে বউবাজার স্ট্রিট থেকে ৬৩ নং মির্জাপুর স্ট্রিটে একটা মদের দোকান সরানোর বিরুদ্ধে মির্জাপুর স্ট্রিটের এক ওষুধের দোকানের মালিক আপত্তি তুলেছিলেন কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে।

আমবাঙালির সুরাবিলাসের আইকন কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের *একেই কি বলে সভ্যতা*-র নববাবু। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মন্তব্য করেছিলেন, *একেই কি বলে সভ্যতা?*-য় বলা প্রায় সব গল্পই সমাজের কোনও না কোনও নববাবুর জীবনের সত্যি ঘটনা। পেটে বিদ্যে কম থাকলেও নতুন ঔপনিবেশিক শাসনের সুযোগে এই নববাবুদের হাতে এসেছিল কাঁচা পয়সা। তাঁরা টক্কর দিতে চান সমাজের গণ্যমান্যদের। দাবি করেন, 'সুপারষ্টিশনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছেন'। তবে সমাজসংস্কারের কোনও চেতনা তাঁদের ছিল না। তাঁদের সব ভাবনাই ছিল নেশাকে ঘিরে। বিচিত্র তাঁদের জীবন। আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের এক অদ্ভুত মিশেল। মদের বিরুদ্ধে নীতিকথা আওড়ালে কাউকেই তারা ছেড়ে কথা বলে না, সে গোঁড়া হিন্দুই হোক বা সংস্কারক। সামাজিকভাবে তারা বজায় রেখেছিল 'হিন্দু-ভদ্র' পরিচয়। কিন্তু নিষিদ্ধ খাদ্য-পানীয়ের স্বাদ নিতে অস্থায়ীভাবে 'নাস্তিক' হতে কোনও দ্বিধা ছিল না। এ ব্যাপারে আদ্যোপান্ত সাহেবসুবোদের নকল করে বেশির ভাগ বাবু মদ বেশি খেত সপ্তাহান্তে, বাগানবাড়িতে। সদলে হাজির হত বিলিতি হোটেলে।

এই বাবুদের ঘিরে তৈরি হল একদল মোসায়েব। জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের *সুধা না গরল* বা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের *আপনার মুখ আপনি দেখ* কিংবা হুতোম *প্যাঁচার নকশা* মোসায়েব জীবনের সুন্দর ছবি তৈরি করে দেয়। বাবু ও তার এই মোসায়েবরা একসঙ্গে সুরাপান করত, কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। বাবুরা আগ্রহী ছিল প্রগতিশীলতা প্রমাণে। মোসায়েবদের ক্ষেত্রে মদের নেশা যেমন আমোদ, তেমনি বিনা খরচে টিকে থাকার উপায়। *কলিকাতা কমলালয়*-এ (১২৩০ বঙ্গাব্দ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, বাবুদের ফুর্তি মোসায়েবদের বেঁচে থাকার রসদ জোটাতে বা বিভিন্ন ব্যক্তিগত চাহিদা মেটাতে সাহায্য করত। নিম্নবিত্ত এই ভদ্রলোকেরা নিজেদের পয়সায় দেশি মদ টানত, দামি মদের স্বাদ পাওয়ার জন্য করত বড়লোকের মোসায়েবি।

তাদের অনেকে অভ্যস্ত ছিল দাঁড়াভোগে, অর্থাৎ মদের দোকানে দাঁড়িয়েই দেশি মদ খেত। পরিবারের সব পুরুষ সদস্য কাজ থেকে ফেরার সময় হাজির হত রাধাবাজারের দোকানে। বাড়ি ফিরে সামান্য কিছু খেয়েই তারা ছুটত ধনীর বাড়ির দামি মদের আসরে। উকিলের ক্লার্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষানবিশ থেকে শুরু করে গরিব বেকার বামুন সবাই নাম লিখিয়েছিল মোসায়েবের দলে। বাবুর প্রতি নয়, টান দামি মদের। তাই বেহিসেবি বাবুর রসদে টান পড়লে অন্য উঠতি বাবুকে ছিপে গাঁথতে দ্বিধা ছিল না মোসায়েবকুলের। জীবনটা যে খুব স্বস্তির ছিল তা নয়। মোসায়েবি করতে গিয়ে বাবুর হাতে লাঞ্ছনা যেমন ছিল তেমনি চাট হিসাবে বিধর্মীর তৈরি অহিন্দু খাবার খেয়ে জাতধর্ম না রাখতে পারার জন্য ছিল অনুতাপ, বিবেকের দংশন। শুধু নেশা নয়, এই পানের আসরে যোগ দিয়ে অনেকে বড়লোকদের সঙ্গে মিশে সমাজে পরিচিতি পেতে চেয়েছিল। সে যুগের ভাষায় 'হাই সার্কেলে ইয়ার্কি' দেওয়ার চেষ্টা।

মদ এক ধরনের সামাজিক সাম্যও এনেছিল। হুঁকোর মতো নানা জাতের আলাদা মদের গ্লাস ছিল না। *সধবার একাদশী*-তে মদ্যপানের দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিমচাঁদ মদকে বলেছেন মহাত্মা, যার প্রভাবে জাতের ভেদাভেদ মুছে গিয়ে একত্রে আহার সম্ভব হয়েছে, পাওয়া গেছে সবান্ধবে অনাবিল আনন্দ। আত্মজীবনীতে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় লিখেছেন, জাতপাতের সংস্কার দূর করতে পানাভ্যাস এক অনন্য উপায়। দুই নিচু জাতের (তাঁতি, নাপিত) বন্ধু নিয়ে উচ্চবর্ণের জমিদার পুত্র উইলসন হোটেলে পানাহারে গিয়ে সমাজের নিন্দার পাত্র হয়েছিলেন।[১১] তবে এই বাবুরা সকলেই প্রকৃত সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। আসলে বাগানবাড়ির পানের আসরে এবং হোটেলে পানাহারে পাঁচমিশেলি সমাগমে জাত বাঁচিয়ে চলাই ছিল দুষ্কর।

মদ্যপান নিয়ে ভদ্রলোক সমাজে যে-অস্বস্তিটা ছিল তা ছোটলোক-ভদ্রলোকের। ঠিক যেমন নিম্নশ্রেণির ইউরোপীয়দের মাতলামো সম্ভ্রান্ত শাসককুলের মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল। ভয়টা নিয়ন্ত্রণ হারানোর। নিয়ন্ত্রণ রাখতে শুধু কব্জির জোর নয়, প্রয়োজন সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের। সাহেবরা মদ খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খেলে যেমন শাসকের প্রতি নেটিভ প্রজার ভয়, শ্রদ্ধা কমবে, নড়বড়ে হবে নিয়ন্ত্রণ, ঠিক তেমনি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হলে ভদ্রলোককেও মেনে চলতে হবে কিছু আচরণবিধি। এ ব্যাপারে মোদ্দা কথাটা কবি ঈশ্বর গুপ্তই লিখে গেছেন: 'ছাড়িয়া ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে।/ দেখো দেখো লোকে যেন মাতাল না বলে।'

তথ্যসূত্র

১. R. C. Majumdar, *History of Ancient Bengal* (Calcutta, 1971, Reprint 2005), P.- 42

২. সুকুমার সেন, *বঙ্গভূমিকা* (কলকাতা, ১৯৭৪) পৃ. ৩২

৩. মনীন্দ্রমোহন বসু, *চর্যাপদ, গান ৩* (কলিকাতা, ১৯৪৩) পৃ. ১৩-১৪

৪. Taponath Chakravarty, *Food and Drink in Ancient Bengal* (Calcutta, 19..) pp. 47-48

৫. Tapan Roychaudhuri, *Bengal under Akbar and Jahangir* (Delhi, 1969) P. 2..

৬. Bengal Public Consultations (mf), 19n January 1722/3, September 1722, Dacca Factory Records (mf) September 1739. cited in Tilottama Mukherjee, *Political Culture and Economy in Eighteenth-Century Bengal: Networks of Exchange, Consumption and Communication* (New Delhi, 2013) P. 2..

৭. মোহিত রায় (সম্পা.), *দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত* (কলিকাতা, ১৯৯০, প্রথম প্রকাশ ১৩০৩) পৃ. ৮৩

৮. সংবাদ প্রভাকর, ২৩ নভেম্বর, ১৮৫৩ এবং সোমপ্রকাশ, ২৯ জুলাই, ১৮৭৮

৯. Financial Proceedings No. 10/11, February 1887, Financial Department ((Excise), Government of Bengal (WBSA)

১০. *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা, কার্তিক ১৭৭৪ শক

১১. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, *কলকাতার ইতিবৃত্ত* (কলিকাতা, ১৯৯১) পৃ. ১৪৬ এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মচরিত* (কলিকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ) পৃ. ..

১২. অরুণকুমার মিত্র (সম্পাদিত), অমৃতলাল *বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি* (কলকাতা, ১৯৮২) পৃ. ১৩৫

১৩. Misc. Proceedings No. 46, 24 September 1824, Board of Revenue (WBSA) এবং Revenue Proceedings No. 22, February 1875, Misc. Revenue (Excise), Government of Bengal (WBSA)

১৪. বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ* (কলিকাতা, ১৯৮৯) পৃ. ৫০

১৫. রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়, *কলি-মাহাত্ম্য* (কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১৯২, নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি, *কলিকুতহল*, পৃ. ১৬ (কলকাতা, ১২৬০ বঙ্গাব্দ) ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী, চক্ষুস্থির ... (কলকাতা, ১২৭২ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৩১, চাঁদগোপাল গোস্বামী, *সুরাসারোদ্ধার* (কলকাতা, ১৮৮৪) পৃ. ১-২

১৬. সুনীল দাশ (সম্পাদিত), মনমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরী (কলকাতা, ১৯৮১) পৃ. ১..

১৭. Revenue Proceedings No. 24, February 1875, Misc. Revenue (Excise), Government of Bengal (WBSA)

১৮. উনিশ শতকের শেষদিকে লেখা দুর্গাদাস লাহিড়ীর *হুইস্কি ব্রাণ্ডির শেকহ্যাণ্ড* এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চিরকুমার সভা* প্রথম হুইস্কি সংস্কৃতির উল্লেখ করে।

১৯. রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *কষ্টিপাথরে* (কলকাতা, ১৮৯৭) পৃ. ৭৮

নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের ৬১ বছর

শুভশ্রী

ISSN 2320-4141

দ্বন্দ্ব সংঘাত বিতর্ক

ঔপনিবেশিক বাংলায়

সুড়ঙ্গ

দ্বন্দ্ব সংঘাত বিতর্ক : ঔপনিবেশিক বাংলায়

৬১ বর্ষ

১৪২৯ বঙ্গাব্দ | ২০২২-২০২৩

সূচি

সম্পাদকীয়

১

কলহের রসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবনা | **বিশ্বজিৎ রায়** ৭

দ্বন্দ্বের বেয়াড়া 'জ্বিন' | **সাত্যকি হালদার** ২২

২

উনিশ শতক : বাঙালির ঘোটমঙ্গল | **আশিস খাস্তগীর** ২৫

স্বদেশপ্রেম ও নর নারীর ভালোবাসা :
ঔপনিবেশিক বাঙালির প্রেমে পড়ার কথা | **বিজলীরাজ পাত্র** ৫৩

৩

বিতর্ক সমুদ্র যাত্রা | **সীমন্তী সেন** ৬১

মদ্যপান ও উনিশ শতকীয় আধুনিকতা | **রক্তিম সুর** ৭৩

রাষ্ট্র, আইন ও বিবাহ : ১৮৯১'র সহবাস সম্মতি আইন এবং বাংলার সমাজ | **শ্রেয়া রায়** ৮৭

৪

স্ববিরোধ, দলাদলি থেকে ভাঙন—
উনিশ শতকের ব্রাহ্মসমাজের ট্র্যাজিক চেতনা | **প্রবীরকুমার বৈদ্য** ১০৭

ইয়ংবেঙ্গল বনাম রামমোহন, সনাতন হিন্দু সমাজ, বিদ্যাসাগর | **শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়** ১২৭

বাঙালি মুসলমানের প্রগতিশীলতা— দ্বন্দ্ব-বিধ্বস্ত পরিক্রমণ | **মইনুল হাসান** ১৩৭

৫

'রাধাকান্ত দেব বনাম...' | **তন্ময় ভট্টাচার্য** ১৫৮

অক্ষয় দত্ত - চর্চার অন্দর বাহির: প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব, বিকল্প পাঠ | **সুমিত চক্রবর্তী** ১৭৪

কবি ও তাঁর প্রতিপক্ষ | **অভ্র ঘোষ** ১৮৬

ফজলুল হক: পরিচিতির দ্বন্দ্ব | **আমজাদ হোসেন** ১৯৫

ভারতে দলিত আন্দোলন ও আম্বেদকর— ঐতিহাসিক বিতর্ক | **সিদ্ধার্থ গুহ রায়** ২০৮

সংগ্রামী সুভাষ : বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও মতভেদের আলোকে | **প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়** ২২৩

সুভাষচন্দ্র ও কমিউনিস্ট মতাদর্শীরা | **গৌতম বিশ্বাস** ২৪০

ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত রাজনৈতিক আন্দোলন : প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এবং যোগেন্দ্রনাথ
মণ্ডলের দলিত মুক্তির আদর্শগত কর্মধারার দ্বৈত কণ্ঠস্বর | **মনোশান্ত বিশ্বাস** ২৪৮

মদ্যপান ও উনিশ শতকীয় আধুনিকতা

রক্তিম সুর

উনিশ শতকে বাঙালির মদ্যপান শুধু ইতিহাসের চর্চার বিষয় নয়, এ নিয়ে আছে একটা সাধারণ আগ্রহ। ফলে উনিশ শতকের মদ্যপ বাঙালিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা আখ্যান। নেশার বিষয়টা মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক হলেও সামাজিক ইতিহাস চর্চার ধারা মেনে জানতে হবে সমকালীন প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ সময়ের জটিলতাকে এড়িয়ে মদ্যাসক্তি-মত্ততা-প্রতিবাদের বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় ধারাকে বোঝা কঠিন। উনিশ শতকে মদ্যপান-সংস্কৃতি জন্ম দিয়েছে নানা বিতর্কের। বিতর্কের মূলে সুরা নিয়ে বাঙালির মনোভাব, যা কোন কালানুক্রমিক বা একরৈখিক ধাঁচ অনুসরণ করেনি। সময়ের সঙ্গে বেশ দ্রুতই বদলেছিল মূল্যবোধ। আবার একই সময়ে একই সামাজিক বন্ধনীতে থেকেও ফারাক দেখা গেছে ভদ্রলোকের মূল্যবোধে। তাই উনিশ শতকে মদ খাওয়া এবং না খাওয়ার কোন তরল ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। পুরো বিষয়টা জটিল হয়ে উঠেছিল ব্যক্তির আচরণে ও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ায় বৈচিত্রের কারণে।

উনিশ শতকের প্রচলিত বিভাজন মেনেই ভদ্রলোক সমাজের প্রাথমিকভাবে সুরাসংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া ছিল তিন ধরনের; রক্ষণশীল, সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিরুচির প্রাধান্যের কারণে মতাদর্শভিত্তিক এই বিভাজন তালগোল পাকিয়ে গেল, একই গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দিল ভিন্ন ভিন্ন মত। শেষপর্যন্ত দানা বাঁধে দুই বিপ্রতীপ ভাবনা, মদ্যপানের পক্ষে ও বিপক্ষে। আর এই লম্বালম্বি বিভাজনে মিশে যায় ভদ্রলোক সমাজের আনুভূমিক বিভাজনের তিন স্তর।

বাংলায় সুরাসংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পশ্চিমি অভিঘাতের ফল। সুসভ্য পাশ্চাত্যের ধারণায় আবিষ্ট উনিশ শতকের দেশীয় সমাজ, বিশেষ করে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্বিধা করেনি সুরাপানের তথাকথিত পশ্চিমি সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে। আবার একই সঙ্গে, ইউরোপীয় সুরাসংস্কৃতির অনেক বৈশিষ্ট্য বাংলায় ছিলও না। যেমন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে বাংলায় গড়ে ওঠেনি কোন পাব-সংস্কৃতি। উনিশ শতকের বাংলায় নেশার ধরনে নিজস্বতাও নজর কাড়ে।

নতুন ঔপনিবেশিক বিন্যাস গড়ে তুলেছিল পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ। উনিশ শতকে বাঙালিকে প্রভাবিত করেছিল ঔপনিবেশিক আধুনিকতা। কিন্তু সুরা বিদেশি সংস্কৃতি, এসেছে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে- মদ্যপানকে ঘিরে এই উনিশ শতকীয় মিথ কিন্তু ভিত্তিহীন। কারণ, বাঙালির মদ্যপানের সংস্কৃতি যথেষ্ট প্রাচীন। সামাজিক নিয়ম ও প্রথায় সুরাপানে নিষেধাজ্ঞা ছিল, আবার ক্ষেত্রবিশেষে ছিল অনুমোদনও। প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বে এলিট, গণ এবং ধর্মীয় সব সংস্কৃতিতেই মদের জনপ্রিয়তা ছিল। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এনেছিল মৌলিক

পরিবর্তন, বাড়িয়েছিল সুরার প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আকর্ষণ। দু'য়ে মিলে প্রভাবিত হয়েছিল তার মদ্যপানের ধরন।

ঔপনিবেশিক আধুনিকতা আর তার মদ্যপানকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল ঔপনিবেশিক নীতি। উনিশ শতকে বাঙালি পশ্চিমি সংস্কৃতির ছোঁয়া পেয়ে আধুনিক হতে চেয়েছিল। এই আধুনিক হতে চাওয়ার সঙ্গে সুরাপানের একটা যোগ এখনও আছে, তখনও ছিল। কিন্তু শুধু আধুনিক হতে চেয়েছিল বলেই বাঙালি মদ খেতে শুরু করেছিল, তা নয়। আবার আধুনিকতারও ছিল অনেক পরত। সেই অনুযায়ী স্থির হয়েছিল মদ খাওয়ার পরিমাণ ও ধরন।

উনিশ শতকে বাঙালির মদ্যাসক্তির কারণ অনেক। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে পানের যেটুকু অনুমোদন ছিল তাতে অমিতাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। যে কোন সময় বা সকলের জন্য নয়, সুরাপানের অনুমোদন ছিল শ্রেণি বিশেষের জন্য, নির্দিষ্ট উপলক্ষে। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ভদ্রলোক শ্রেণির উপর মহলে মদ্যপান ছিল এক আমোদ-ফুর্তির বিষয়, যা সামাজিকভাবে কিছুটা বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক নীচের স্তরের কাছেও কিন্তু তা শুধু বিশুদ্ধ আমোদের জন্য নয়। মদ খেয়ে তারা ভুলতে চেয়েছিল প্রতিদিনের উঞ্ছবৃত্তি। তাছাড়া, ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুতে ঔপনিবেশিক প্রভুদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য সুরাকে ব্যবহার করেছিল রক্ষণশীল বা সংস্কারপন্থী সব ধরনের এলিট। নতুন ঔপনিবেশিক নগরীয় জীবনে ধর্মীয়-সামজিক কর্তৃপক্ষের চোখরাঙানি তুলনামূলকভাবে কমেছিল, শিথিল হয়েছিল সামাজিক বন্ধন। ফলে পালটেছিল মদ্যপানের প্রতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্মীয় অনুশাসন আর সামাজিক হেনস্থার ভয় বা জড়তা কাটিয়ে প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের মদ্যপানের এলিট এবং অন্ত্যজ সংস্কৃতি পরিণত হল গণ-সংস্কৃতিতে। প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের সঙ্গে উনিশ শতকের মদ্যপান সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল পরিমিতিবোধের অভাব।

মদ্যাসক্তি ভদ্রলোকের জীবনে ঘর ও বাহির, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে তথাকথিত আগল অস্পষ্ট করে দিয়েছিল, স্পষ্ট করেছিল ভদ্রলোক শ্রেণির ভেতরের দ্বন্দ্ব। উনিশ শতকে নেশা উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। নিম্ন শ্রেণির মধ্যে মদসহ নানা নেশার প্রাবল্য থাকলেও এই সময় যাবতীয় উদ্বেগ ছিল শুধু মধ্যবিত্তকে নিয়েই। দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া নিম্ন শ্রেণির অমিতাচারকে সচেতনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। কারণ, ধরে নেওয়া হয়েছিল নেশা তাদের মজ্জাগত।

উনিশ শতকে ভদ্রলোকের মদ্যপান সংস্কৃতির চরিত্র ছিল বহুমুখী। মদ্যপানে অভ্যস্ত বিভিন্ন শ্রেণি এবং গোষ্ঠীর রুচি ও পানের ধরন ছিল আলাদা। বিভিন্ন প্রকার মদের দামের ওঠানামার সঙ্গে রুচির একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। যুগের হাওয়ায় জনপ্রিয় হয়েছিল কখনও রম বা ব্রাণ্ডি আবার কখনও হুইস্কি। ভদ্রলোকদের একটা বড় অংশের কাছে বিলেতি মদ খাওয়া ছিল ফ্যাশন, ঠাটবাটের প্রতীক। দামি মদ কেনার সামর্থ্য না থাকলে মান বাঁচাতে ভরসা ছিল সস্তা নিম্নমানের মদ। নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকেরা নিজেদের

পয়সায় খেত দেশি মদ, দামি মদের স্বাদ পাওয়ার জন্য করত বড়লোকের মোসায়েবি।

সুরাসংস্কৃতি বাঙালিকে এনে ফেলেছিল নানারকম টানাপোড়েনের মধ্যে। কেউ গোপনে পরিমিত মদ খেত, কারো কাছে নিষিদ্ধ খাদ্য সহযোগে আকণ্ঠ মদ্যপান করে প্রকাশ্যে মাতলামো করাটাই ছিল নিজেকে আধুনিক প্রগতিশীল প্রমাণ করা। ধনীরা আড়ম্বর সহকারে পানের আসর বসাত নিজেদের আর্থিক ক্ষমতা জাহির করতে, আর দরিদ্র মোসায়েবরা হাজির হত গ্রাসাচ্ছাদন নিশ্চিত করার জন্য। উঁচু স্তরের মানুষের সঙ্গে মেশার জন্য আর্থিক-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকেদের লাইসেন্স ছিল মদ। তাদের এই আচরণ ধরা ছিল সেযুগের এক চমৎকার শব্দবন্ধে, 'হাই সোসাইটিতে ইয়ারকি'। আধুনিক-রক্ষণশীল নির্বিশেষে সকলেই মদের নেশায় মজলেও অনুপান হিসেবে নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণে রক্ষণশীলদের কেউ কেউ দ্বিধা করত। মদ্যপানকে ঘিরে ভণ্ডামিও কম ছিল না। অর্ধশিক্ষিত, স্বশিক্ষিত একটা গোষ্ঠী শুধুমাত্র নেশার সুযোগ পেতে নিজেদের আধুনিকমনস্ক বলে তুলে ধরেছিল। তাদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল ভদ্রলোকের আরেকটা গোষ্ঠী। অন্যদিকে প্রকৃত শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকে গোপন করতে চেয়েছিল নিজেদের পানাভ্যাসের কথা কিংবা নিজেরা ঘোরতর মদ্যপায়ী হয়েও প্রচার করেছিল মদ্যপানবর্জনের। পানসংস্কৃতিতে এসেছিল ছোটলোক-বড়লোক বিভাজন। অর্থবান শিক্ষিতের পানদোষ নিন্দনীয় নয়, কারণ সে সংযমী। কিন্তু গরিব অশিক্ষিত ছোটলোক মদ খেয়ে মাতাল হতেই অভ্যস্ত। তারা সস্তা দেশি মদ খেত। তাদের সঙ্গে দামি বিলেতি মদবিলাসী বড়লোকদের কোন তুলনাই চলে না। ছোটলোকের মদ খাওয়া গর্হিত অপরাধ। শুধু তথাকথিত ছোটলোক নয়, চিকিৎসক, আইনজীবী, মোক্তার ইত্যাদি ভদ্রলোকের কিছু গোষ্ঠীকেও মদ্যাসক্ত বলে দেগে দেওয়া হয়েছিল। সে সময়ের সামাজিক আলাপচারিতায় সমালোচিত হয়েছিল ভদ্রলোকের পানাভ্যাস।

মদ সম্পর্কে বাঙালির মনোভাব ছিল বহুমাত্রিক। কোন নির্দিষ্ট ধাঁচ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। মনোভাব বদলে গিয়েছিল এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে, আলাদা ছিল গোষ্ঠীভেদে। এমনকী, মদের প্রতি একই গোষ্ঠীর সকলের মনোভাব একরকম ছিল না। চিরাচরিত সমাজের টান নির্মূল না হওয়ায় ভদ্রলোকের দ্বিধা ছিল স্পষ্ট। আসলে মদ খাওয়া বা না খাওয়ার পিছনে সেভাবে কোন ভাবাদর্শ কাজ করেনি। সবটাই নির্ভর করত ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর।

বাংলায় মদ্যপান সংস্কৃতির চরিত্র ছিল বহুমুখী। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি ও গোষ্ঠীর রুচি ও পানের ধরন ছিল আলাদা। ধনী বাবুরা বুক ফুলিয়ে সাড়ম্বরে যেত বাগানবাড়ি কিংবা বেরিয়ে পড়ত তীর্থযাত্রায়। সঙ্গে থাকত অফুরান মদের ভাণ্ডার আর মোসায়েবকুল। শিক্ষিত বাবুদের ছিল মধ্যবিত্তসুলভ সংকোচ বা শালীনতা। তাই আড্ডা বসাত ডাক্তারখানায়। সেখানে পাওয়া যেত ওষুধের আড়ালে অ্যালকোহল। নিম্ন মধ্যবিত্তের ছিল দাঁড়াভোগ, অর্থাৎ দোকানে দাঁড়িয়েই মদ্যপান। অতি উৎসাহী কেউ কেউ সাহস করে সপারিষদ পৌঁছে যেত বিলেতি হোটেলে।

পানসংস্কৃতিতে এসেছিল শ্রেণিবিভাজন। ভদ্রলোকদের একটা বড় অংশের কাছে বিলেতি মদ খাওয়া ছিল ফ্যাশন, ঠাটবাটের প্রতীক। দামি মদ কেনার সামর্থ্য না থাকলে মান বাঁচাতে ভরসা ছিল সস্তা নিম্নমানের বিলেতি। দেশি মদ খাবে খেটে খাওয়া লোকেরা। আবার নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকেরা নিজেদের পয়সায় খেত দেশি মদ, দামি মদের স্বাদ পেতে জন্য করত বড়লোকের মোসায়েবি।

ভদ্রলোকের মদ্যপানের কারণ হিসেবে কাজ করেছিল নান যুক্তি কিংবা অজুহাত। সংস্কারপন্থীরা সুরাপানকে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখেছিল। অন্যদিকে প্রগতিশীলরা মনে করেছিল, মদ্যপান ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বন্ধনমুক্তি সর্বসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য তারা আগ্রহী ছিল প্রকাশ্য মদ্যপানে। আবার উলটোটাও হতে পারে। মদ খাওয়ার তীব্র বাসনাকে তৃপ্ত করতে উপর-নীচ সব স্তরের বেশিরভাগ ভদ্রলোকই আশ্রয় নিয়েছিল ছদ্ম-আধুনিকতার। এই সন্দেহ আরও জোরালো হয় যখন দেখা যায়, ভদ্রলোক সমাজের অ-আধুনিক, এমনকী রক্ষণশীলরাও মদ্যপান থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারছে না। মদ্যাসক্তির বিষয়টা আরও জটিল হয়ে পড়ে। আধুনিকতা-মদ্যপান সমীকরণ নিয়ে দেখা দেয় প্রশ্নচিহ্ন। প্রগতিশীল চিন্তা ও আচরণ সমাজের ওপর থেকে নীচের স্তরে চুঁইয়ে পড়েছিল। সমাজের উপরের স্তরের প্রথা ও প্রতিষ্ঠান নীচের স্তরের মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল আদর্শ।

মদ্যপানের কারণ প্রসঙ্গে সংস্কারপন্থী ও রক্ষণশীলরা মিলে গিয়েছিল একটা মৌলিক ভাবনায়। তাঁদের মতে, পাশ্চাত্য শিক্ষাই যুবকদের মদ্যপানের কারণ। তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন ভারতীয়দের মদ্যপানের দীর্ঘ ইতিহাসকে। স্বীকার না করার কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন। একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে, ভদ্রলোক শ্রেণির উত্থান ঘটেছিল এমন এক সামাজিক গোষ্ঠী থেকে যারা প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে মদ থেকে দূরে থাকত। সে যুগে মদ্যাসক্তিকে মনে করা হত অভিজাত এবং নিম্ন শ্রেণির মানুষের চারিত্রিক অনুষঙ্গ।

সমাজের ওপরের স্তরে থাকা শিক্ষিত ভদ্রলোকের একটা অংশ আবার নিজেদের পানাভ্যাস নিয়ে বিচলিত ছিল না। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বের অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে অকালমৃত্যু দেখেও তারা বিশ্বাসী ছিল ইউরোপীয় প্রবচনে। পরিমিত মদ্যপান আসলে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। ভদ্রলোকের একটা অংশের এই দ্বিচারিতার উল্লেখ ছিল প্রহসনেও। *সুধা না গরল*-এ লুকিয়ে মদ্যপানে আসক্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক রামেশ্বর ঘোষণা করেছিল, সাধারণ মানুষকে সর্বনাশ থেকে রক্ষা করতেই তার মিতাচারের প্রচার, নিজের জন্য নয়।[১] কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের *বৌবাবু*-তে রামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিল, মদ উদ্দীপকের মতো কাজ করে। এই উদ্দীপক না থাকলে তাদের পক্ষে গুছিয়ে বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হত না।[২]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে নানা কারণে পালটে গেল মদ নিয়ে বঙ্গীয় ভদ্রলোকের ভাবনা-চিন্তা। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ও সুরার সম্পর্কও একমুখী নয়। আধুনিক ভাবনা শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে একসময় যেমন সুরাপানে আগ্রহী করেছিল

পরবর্তীকালে তার মদ্যপানবর্জনের প্রেরণাও ছিল নিজেকে আধুনিক প্রমাণের তাগিদ। মূল্যবোধের নতুন মাপকাঠি ও দৃষ্টিভঙ্গি ভদ্রলোককে মিতাচারের প্রচারে উৎসাহিত করেছিল। মদ্যপান প্রতিরোধ বা মিতাচার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কোন নির্দিষ্ট ধাঁচ পাওয়া যায় না, লক্ষ করা যায় নানাধর্মিতা। প্রাথমিকভাবে, তারা সমাজসংস্কার হিসেবেই মিতাচারের তাগিদ অনুভব করেছিল। বাংলায় অধিকাংশ মদ্যপানবর্জন আন্দোলনকারী বিশ্বাস করতেন, মদ্যাসক্তি পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত অসদাচরণ। সদাচরণ দিয়েই তাকে পালটানো যায়। তাঁদের অনেকেই চিরাচরিত বন্ধন বজায় রেখেছিলেন বলে তাঁদের যুক্তিতে ছিল প্রাচীন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি। পাপাচার হিসেবে নিন্দিত হয়েছিল মদ্যপান। ভিক্টোরীয় নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যরা পানাভ্যাসকে মনে করেছিল কুঅভ্যাস। তারা মদকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নানা প্রভাবের সঙ্গে যেমন যুক্ত করেছিল, তেমনি সুরা নিয়ে নৈতিক আপত্তির শিকড় ছিল চিরায়ত ঐতিহ্যের মধ্যে। উনিশ শতকের শেষদিকে এই নৈতিক বক্তব্যকে স্বাস্থ্যচিন্তা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে জোরালো করা হয়েছিল। অদ্ভুতভাবে মিশে গেল দুই বিপরীত চরিত্রের যুক্তি। চিরাচরিত যুক্তির বৈজ্ঞানিক মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞানকে গ্রহণযোগ্য করতে ব্যবহার করা হল কৌলিক যুক্তির ভাষা। সর্বোপরি সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার সবচেয়ে বড় অন্তরায় মদ। তাই অমিতাচার থেকে মানুষকে বাঁচাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মদের যোগান। দাবি ছিল সরকারি উদ্যোগের, যার অভিমুখ হবে জনস্বাস্থ্য।

১৮৩০-এর দশকে প্রগতিশীলদের উত্থানের আগে ভদ্রলোকরা আস্থা রেখেছিল পরিমিত মদ্যপানে। কিন্তু হঠাৎ তারা দেখল প্রগতিশীলদের অত্যুৎসাহে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পরিমিত ও অপরিমিত পানের মধ্যে থাকা সংযমের প্রাচীর। শুধু রক্ষণশীল সমাজ নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের একটা অংশও প্রগতিশীলদের আচরণ নিয়ে ছিল উদ্বিগ্ন। প্রগতিশীল যুবকরা যেভাবে পশ্চিমি রীতি ও ধ্যানধারণাকে আত্মস্থ করেছিল তা হয়ে ওঠে শিক্ষিত এলিট সমাজে বিতর্কের বিষয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে শিক্ষিত এলিটরা ভিক্টোরীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বদলে ফেলেছিল তাদের আগের অবস্থান। অনেকেই অনুসরণ করেছিল ইংরেজ সংস্কারকদের। তারা প্রকৃত ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের আবগারি নীতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল অসঙ্গতি।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির একটা বড় অংশ মনে করেছিল, মদ্যাসক্তি প্রবেশ করেছে সমাজের গভীরে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলনে হাত মিলিয়েছিল বিপরীত মতাদর্শে বিশ্বাসী ভদ্রলোক সমাজের দুই গোষ্ঠী। সংস্কারপন্থী ও রক্ষণশীল দু'দলই ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তুলেছিল একই প্রশ্ন। ব্রিটিশরা কি নৈতিক উন্নতির আদর্শ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে? তাদের অভিযোগ ছিল, ব্রিটিশ শাসনকালে চালু হওয়া মদ্যপানের মতো কিছু বিনোদন হিতকর তো নয়ই, নৈতিকও নয়। মদ্যাসক্তিকে তারা মনে করত নৈতিক দেউলিয়াপনা। তবে এই নৈতিক স্খলনের জন্য ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করার ব্যাপারে সংস্কারপন্থী ও রক্ষণশীলদের বক্তব্য ছিল আলাদা। পশ্চিমি সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগে

অটল থেকে সংস্কারপন্থীরা বলেছিল, এই সংস্কৃতির মূল ভাবনা থেকে সরে এসে এদেশে ইংরেজ সরকার প্রশ্রয় দিয়েছে মদ্যাসক্তিকে। অন্যদিকে, রক্ষণশীলরা মদ্যপান ও পশ্চিমি সংস্কৃতিকে মনে করেছিল অবিচ্ছেদ্য; কারণ খ্রিস্টধর্মেই স্বীকৃতি আছে মদ্যপানের। মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জনের বিধান উল্লেখ করে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের বক্তব্য হল, হিন্দু ধর্মে মিতাচার ও সামাজিক বিশুদ্ধতার ধারণা কঠোর তপস্যার অঙ্গ। আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত মিতাচারকে।

রক্ষণশীলরা খাদ্য-পানীয়ের ব্যাপারে স্মৃতির বিধান মেনে কঠোর শাস্ত্রীয় রীতি সম্পূর্ণ সঠিক আচার পালনের কথা বলেছিল। *আচার প্রবন্ধ*-এ শাস্ত্রীয় বিধান পুরোপুরি মেনে চলার পরামর্শ দেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এই বিধানগুলো হয়ত সন্দেহাতীতভাবে যুক্তিসঙ্গত নয়, কিন্তু বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।[৩] *পারিবারিক প্রবন্ধ*-এ পারিবারিক সুখের সন্ধান দিতে গিয়ে তিনি জোর দিয়েছেন চিরাচরিত মূল্যবোধের ওপর। শাসকের অনুকরণ ভারতীয়দের মর্যাদা ও আত্মসম্মানের পক্ষে অবমাননাকর। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, পশ্চিমি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবিলায় তারা পশ্চিম থেকে আসা মুদ্রণ সংস্কৃতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল, এমনকী হাত মিলিয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে। রক্ষণশীলরা বাংলায় মিশনারি কর্মকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করলেও মিতাচারের মিশনারি উদ্যোগে সামিল হতে দ্বিধা করেনি। চার্লস হেনরি অ্যাপলটন ডালের কাজে মুগ্ধ হয়ে তাকে সক্রিয় সহযোগিতা করেন শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব। আমেরিকান মিশনারি ডালের *টেম্পারেন্স প্লেজ*-র আবেদন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে তিনি তা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রগতিশীল মধুসূদন দত্তের *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০)-এ মদ্যপানের সমালোচনা করা হয়েছিল। তাই এই প্রহসনের প্রশংসা করেছিলেন রক্ষণশীল রামগতি ন্যায়রত্ন।[৪]

রক্ষণশীল সমাজ তার নিজস্ব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে মদ্যপান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিল। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সম্পত্তি থেকে তাঁর পুত্র রাধামোহন বঞ্চিত হয়েছিলেন মদ্যপানের অপরাধে। তবে একে সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বলা যায় না। মদ্যপ হওয়া সত্ত্বেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। তবে ধর্মশাস্ত্রের অন্যতম কঠোর অনুশাসন লঙ্ঘিত হলেও মদ্যপানের জন্য সমাজচ্যুত করার মতো কঠিন শাস্তির বিধান দেওয়া হয়নি। *সোমপ্রকাশ* (১৫ বৈশাখ, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ) খেদ প্রকাশ করে লিখেছিল, চোদ্দো বছরের বেশি বয়সের অবিবাহিতা কন্যা থাকলে সমাজচ্যুত করা হয়, কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য এমন কোনও শাস্তি নেই।[৫]

মদ্যপানবর্জন বা মিতাচারের কর্মসূচি ছিল ভদ্রলোককেন্দ্রিক। বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটির বিভিন্ন শাখার সম্পাদকদের সঙ্গে মাতালদের পদমর্যাদা বা পেশাগত পার্থক্য ছিল না।[৬] শিক্ষিত ভদ্রলোকই ছিল সমাজের আশা-ভরসা। তাই ভদ্রলোক সমাজের নীচে থাকা অংশ আড়ালে থেকে গিয়েছিল আমজনতা হিসেবে। সংস্কারকদের মনোযোগ আটকে ছিল ভদ্রলোক সমাজের ওপরের স্তরে। কেশবচন্দ্র সেনের মতো সংস্কারকরা

মনে করতেন, সমাজের উচ্চ শ্রেণির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন নিম্ন শ্রেণির চেয়ে অনেক বেশি উদ্বেগজনক।[৭] মেরি কারপেন্টারকে লেখা এক চিঠিতে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেন, বাংলার মিতাচার সমিতিগুলো দীর্ঘদিন শুধুমাত্র ভদ্রলোকদের পানাভ্যাস থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল।[৮] মেসার্স জিল্যাণ্ডার্স, আরবুথন্ট এণ্ড কোং ইত্যাদি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্সকে লেখে, মিতাচার সমিতিগুলো ছিল বাবুশ্রেণির মেলামেশা ও বাগ্মিতা দেখানোর জায়গা। তাই সমিতির সভা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয় সাধারণ মানুষকে। এভাবে মদ্যপান কমানো যাবে না বলেই তারা মনে করেছিল।[৯] নীচুতলার মানুষের মাতলামি সম্পর্কে ভদ্রলোকেরা যে অবগত ছিল না, তা নয়। আসলে তারা বিশ্বাস করত, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি অন্ত্যজরা প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই স্বভাবগতভাবে মদ্যপ। মদ সস্তা হওয়ার সঙ্গে তাদের মাতলামি বেড়ে যাওয়ার একটা যোগাযোগ প্রমাণের চেষ্টা করলেও সরাসরি এই শ্রেণির মধ্যে মিতাচার কর্মসূচির উদ্যোগ সংস্কারকরা নেননি। কারণ ভদ্রলোকরা বুঝতেই পারেনি যে প্রবল অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে থাকা নিম্ন শ্রেণির অবস্থাকেও উন্নত করতে পারে মিতাচারের পরামর্শ। অন্যদিকে, বাৎসরিক শোভাযাত্রার সময় জেলেপাড়ার সঙের গানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে উঁচু জাতের পানাভ্যাসকে। নিচু জাতের এই গানে স্পষ্ট ধরা পড়েছে মদ্যপান বিষয়ে ভদ্রলোকের ভণ্ডামি। ভদ্রলোকের মত্ততা নিয়ে নিম্ন শ্রেণির বিদ্রুপ ছড়িয়ে আছে উনিশ শতকের প্রহসনে।

তবে সংকীর্ণ গোষ্ঠী-চিন্তা ভদ্রলোক ভাবনার একমাত্র ধারা নয়। ব্যতিক্রমী হলেও বাঙালি ভদ্রলোকের একটা অংশ নিজেদের গোষ্ঠীর গণ্ডির বাইরে গিয়ে নীচুতলার মানুষের নেশা কমানোর কথা ভেবেছিল। শশীপদ ব্যানার্জি মিতাচার প্রচারের কাজ করেছিলেন বরানগরে, চটকল শ্রমিকদের মধ্যে। মুর্শিদাবাদ অ্যাসোসিয়েশন শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছিল যাতে তারা কর্মস্থলে পরিবার সঙ্গে রাখতে পারে। পরিবারের মধ্যে থাকলে তারা হয়ত মদ খাবে না। এক্সাইজ কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মফস্বলের বেশিরভাগ সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ছোট ব্যাবসায়ী, চাষী, শ্রমিক ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণির মানুষের নেশা নিয়ে। কারণ এই শ্রেণির মানুষ আগে ছিল মিতাচারী।[১০]

মদ্যাসক্তি আন্দোলনকে সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলেও সমালোচিত হয়েছিল প্রশাসনের ভূমিকা। মদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুটো দিক ছিল, আবগারি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং মিতাচার কর্মসূচি। মিতাচার আন্দোলনকারীরা অমিতাচারের জন্য পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পাশাপাশি বিশেষভাবে দায়ী করেছিল প্রচলিত আবগারি ব্যবস্থাকে। সরকারি নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা খোলাভাঁটি বন্ধের দাবি জানান। কারণ এই ভাঁটিগুলোতে তৈরি নিম্নমানের মদের ক্রেতা ছিল ভদ্রলোক সমাজের নীচের অংশ।

মদ্যপানবর্জন কর্মসূচি ছিল উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম আগ্রহের

বিষয়। এই শতকের দ্বিতীয়ভাগে মদ্যপানের সমস্যা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সংস্কারকদের মনে হয়েছিল সমাজকে রক্ষা করতে এই আন্দোলন শুরু করা জরুরি। গুরুত্ব পেয়েছিল কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার বা শশীপদ ব্যানার্জির মতো রোল মডেলদের ভূমিকা। তাঁরা মদ্যপানের বিরুদ্ধে শুরু করেছিলেন ধর্মযুদ্ধ। মদ্যপানজনিত কদাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দ্বিমুখী; সামাজিক ও অর্থনৈতিক। একদিকে নৈতিক অধঃপতন ও স্বাস্থ্যের অবনতি, অন্যদিকে দারিদ্র ছিল মদ্যাসক্তির প্রত্যক্ষ ফল। সমাজসংস্কারের তাত্ত্বিক দিক ছাড়াও উনিশ শতকের সমাজচিন্তায় পারিবারিক মূল্যবোধের জন্য উদ্বেগও ফুটে উঠেছিল উনিশ শতকের বাঙালি চিন্তায় দৃষ্টবাদের (optimism) শক্তিশালী প্রভাবে স্পষ্টতই চিরাচরিত পরিবার ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিল।[১১]

বাংলায় মদ্যপানবর্জন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মূলত ব্রাহ্মরা। অল্পবয়সীদের মনে পানাভ্যাসের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলতে ব্রাহ্মসমাজ খুলেছিল একটা মিতাচার বিভাগ। ভিক্টোরীয় সংস্কৃতির অনুকরণে তাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন লোকহিতে। অনুভব করেছিলেন সমাজের জন্য কিছু করার প্রবল তাড়না। তা সত্ত্বেও এই উদ্যোগ কিন্তু অনেকটাই ব্যক্তিগত, ব্রাহ্ম নৈতিকতার সমবেত প্রয়াস নয়। সুরাপানবর্জন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের আবশ্যিক শর্ত করা হলেও তা আদতে পরিণত হয়েছিল কেবল দেখনদারিতে। ব্যক্তিগত জীবনে ব্রাহ্মরা সকলে সুরা পরিহার করেনি। রামমোহন স্বয়ং এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অগ্রণী ব্রাহ্মরা ছিলেন পরিমিত পানে বিশ্বাসী।

সংস্কারকদের মধ্যে কয়েকজন নিজেরাই অতীত জীবনে ছিলেন ঘোরতর মদ্যপায়ী। পরবর্তীকালে জাগ্রত বিবেক তাঁদের ঠেলে দিয়েছিল মিতাচারের পথে। আবার পরিবারের কোন সদস্যের মাতলামি দেখে তাঁরা শঙ্কিত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, শশীপদ ব্যানার্জি এবং প্যারীচরণ সরকার নিজেদের পরিবারের মধ্যেই দেখেছিলেন নেশাগ্রস্ত মানুষ। অনেক সংস্কারক নিজেদের পানাভ্যাসের কথা স্বীকার করে অনুশোচনা করেছেন তাঁদের আত্মজীবনীতে। তাঁদের এই ব্যক্তিগত পাপবোধ বিশেষভাবে নজর করার মতো। এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে আমেরিকার মদ্যপানবর্জন আন্দোলনের কর্মসূচির খুব মিল ছিল। সেখানে মদ্যপানবর্জন সভায় পানাসক্তরা তাদের মদ্যপানজনিত পাপ স্বীকার করত, যা তাদের ধর্মীয় কর্মসূচিরও অঙ্গ। এদেশে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুদ্ধাচারী জীবন থেকে তাঁর বিচ্যুতির কথা স্বীকার করেছেন আত্মজীবনীতে। তিনি পানাভ্যাস বর্জনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বলেন, মদ্যপান ধর্মবিরুদ্ধ।[১২] অন্যদেরও উপদেশ দেন এই পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য। এরপর অসুস্থতার সময় চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া তিনি আর কখনো সুরাপান করেন নি।[১৩] তবে এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, দ্বারকানাথের মৃত্যুতে আর্থিক দুরবস্থার মুখোমুখি হওয়ার পরই তিনি চিরকালের জন্য মদ ছেড়েছিলেন। জীবনের 'বিপ্লবী' পর্ব শেষ হওয়ার পর রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের স্খলনের কথা স্বীকার করেছেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে

গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার পরই তার চেতনা ফেরে, বাধ্য হয়েছিলেন পরিমিত মদ্যপানে। উনিশ বছর বয়সে এক প্রবল মানসিক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়ে শশীপদ ব্যানার্জি সিদ্ধান্ত নেন পানাভ্যাস ত্যাগের। নতুন প্রজন্মের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে রামতনু লাহিড়ী মদ ছেড়েছিলেন। *আত্মচরিত*-এ নবীন বয়সে মদের প্রলোভন এড়াতে না পারার কথা বলেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, মদ্যপানকে পাপ হিসেবে দেখার চিরাচরিত বিশ্বাস অগ্রাহ্য করে তারা সুরাপানকে মনে করেছিলেন সভ্যতার চিহ্ন। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মাতলামির যে দৃষ্টান্ত শিক্ষিত যুবকরা রেখেছিলেন তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। মদ্যপান জনপ্রিয় করতে নিজের ভূমিকায় অনুতপ্ত ছিলেন কার্তিকেয়চন্দ্র। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, মৃত্যুকালে নিজের করুণ অবস্থা উপলব্ধি করে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অন্যদের সাবধান করেছিলেন।[১৪] এরকম বহু মান্যগণ্যের সন্ধান মেলে যাঁরা নিজেদের নেশাগ্রস্ততার জন্য অনুতাপ করে মদ্যপানের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন।[১৫] *বাঞ্ছারামের গল্প* (১৮৬৯), *লোভে পাপ পাপে মৃত্যু* (১২৭৮ বঙ্গাব্দ), *কুলপ্রদীপ* (১২৭৮ বঙ্গাব্দ), *মাতালের জননী বিলাপ* (১২৮০ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি প্রহসনে আছে মাতালের অনুতাপ। মাতালরা স্বীকার করেছিল মদের কুপ্রভাব সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির কথা।[১৬]

ভিক্টোরীয় বাংলায় প্রত্যাশিত ছিল, একজন সংস্কৃতিবান বাঙালি ভদ্রলোক পারিবারিক বৃত্তে মদ্যপান করবেন না।[১৭] শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা অংশের কাছে গণ পরিসরে মদ ছিল নিষিদ্ধ, নেশার বিরুদ্ধে জেহাদেও তারা অনড়। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষিত বাঙালি কখনো কখনো মদের প্রতি দেখিয়েছিল নরম মনোভাব। পারিবারিক ক্ষেত্রে নেশার সমস্যাকে উপেক্ষা করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে। অন্যদিকে মহিলারা কিন্তু সুযোগ পেলেই মুখর হয়েছিল প্রতিবাদে। বিপিনচন্দ্র পালের পরিবার ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব। তা সত্ত্বেও পরিবারের পুরুষ সদস্যরা জেনে শুনে মদ্যাসক্ত পাত্রের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের বোনের বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন। কারণ, তাদের মনে হয়েছিল এটুকু বাদ দিলে ছেলেটা অত্যন্ত সুপাত্র। বিপিনচন্দ্র স্বয়ং এই বিয়েতে আপত্তি করতে না পারলেও তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর মা। কিন্তু ইতিমধ্যে বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে। তাই এই অবস্থায় বিয়ে ভেঙে দিলে পরিবারের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। পুরোপুরি পুরুষ শাসিত মধ্যবিত্ত মানসিকতা কাবু করেছিল নীতিবোধকে, রুদ্ধ করেছিল নারীকণ্ঠ। মেয়েটার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নয়, বিয়ে না ভাঙার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সমাজে মানহানির ভয়, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রধানের কথার দাম রাখার তাগিদ ইত্যাদি। এমনকী, বিপিনচন্দ্রও পাত্রের চরিত্র সম্পূর্ণ কলঙ্কহীন বলতে দ্বিধা করেননি। স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা নিয়ে ভদ্রলোকের উদ্বেগ সে সময়ের এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের পারিবারিক পরিসরে ঢুকতে পারেনি। পরিবারের মেয়েটি কিন্তু স্বামীর পানাভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই করেছিল।

কলকাতার আরও প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের মনোভাবও আলাদা

কিছু ছিল না। *সুলভ সমাচার*-এর (২৩ বৈশাখ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ) প্রতিবেদনে দেখা যায়, এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে মাতাল পাত্রকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখেছেন, তিনি প্রতি রাতেই একেবারে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরার কারণে তাঁর মা খুব রেগে গিয়ে মদ খাওয়া না ছাড়লে বোড়ালে বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার ভয় দেখাতেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য তাঁর বাবা বিরক্ত হলেও রাজনারায়ণকে শাসন করেননি, বরং বাড়িতে নিয়ন্ত্রিত পানের অনুমতি, এমনকী সঙ্গও দেন।

অন্যদিকে বেশির ভাগ প্রহসনে দেখা যায় বাঙালি মা স্বভাবসুলভভাবে ছেলের প্রতি স্নেহান্ধ। দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী*-তে অটলকে তার বাবা শাসন করতে গেলে বাধা দিয়েছিল তার মা, এমনকী গোপনে মদ খাওয়ার টাকা দিয়ে অটলকে প্রশ্রয় দেয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরে দুলাল* (১৮৬১), হরিশচন্দ্র মিত্রের *ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে* (১৮৬৩) এবং রামচন্দ্র দত্তের *বাল্যবিবাহ*-এ (১৮৭৪) ছিল মায়ের এমন চরিত্রায়ন। পুত্রকে শাসনে কঠোর পিতা ছিল প্রহসনের মূল ভাবনা। প্রহসনগুলো লিঙ্গবৈষম্যের ছকে সমাজের ছবি আঁকলেও আত্মজীবনীগুলোতে সবসময় তার সমর্থন মেলে না।

যদি ধরে নেওয়া হয়, ঔপনিবেশিক আধুনিকতা বাঙালি ভদ্রলোকদের মদ্যপানে প্ররোচিত করেছিল, তা হলে এটাও বলতে হবে, এই আধুনিকতাই ভদ্রলোককে একটা নিজস্ব পরিচয় গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছিল। সম্পূর্ণ মদ্যপানবর্জন সেই 'খাঁটি' ভদ্রলোকের অন্যতম সদ্গুণ। অন্তত ছোটলোকের মতো প্রকাশ্য মদ্যপান তো চলবেই না। আধুনিকতা বা সভ্যতার পরিচয় হিসেবে মদ্যপানের বদলে গুরুত্ব পায় মিতাচার। তবে লক্ষণীয়, নিজেদের ভাবমূর্তি ঠিক রাখতে উচ্চ শ্রেণির ইংরেজরা যখন ইউরোপীয় ছোটলোকদের মিতাচারী করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল, বাঙালি ভদ্রলোকরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল মদ্যপ স্বদেশীয় ছোটলোকদের থেকে দূরত্ব তৈরিতে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে পাল্টাতে শুরু করেছিল 'আধুনিকতা' বা 'সভ্যতা' সম্পর্কে ধারণা। ভিক্টোরীয় রুচিবোধ প্রভাব ফেলেছিল এলিটের জীবনদর্শনে। সমাজ শুদ্ধিকরণে ব্রাহ্ম নীতিনিষ্ঠার অন্যতম প্রকাশ মিতাচার আন্দোলন। কিন্তু মজার বিষয়, ব্রাহ্ম নেতা বা উপাসকদের একটা বড় অংশ যথেষ্ট আসক্ত ছিল মদ্যপানে। অব্রাহ্ম ভদ্রলোকেরাও ব্যতিক্রম ছিল না। তাই প্রকাশ্য মদ্যপান হয়ত কমল, কিন্তু বহুগুণ বেড়ে গেল ব্যক্তিগত পরিসরে গোপনে মদ খাওয়া। মদ নিয়ে যাদের ছুঁৎমার্গ ছিল না এবং অভ্যস্ত ছিল একান্তে মদ্যপানে, তারাই আবার আপত্তি জানাত মদের দোকান খোলার লাইসেন্সের জন্য যে কোন প্রস্তাবে। এটা প্রায় জাতীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। ১৯০৩ সালের ১২ মার্চ সংখ্যায় বম্বের *ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্ম* লেখে, দিল্লির দরবারে ব্রিটিশ মিতাচার আন্দোলনের নেতা ডবলু. এস. কেইনের অনুগামীরা ১৫০০ টাকার মদ খেয়েছে, যা তৎকালীন হিসেবে বেশ বড় অঙ্ক। একেবারে শুরু থেকেই আন্দোলনের একটা মৌলিক সঙ্কট ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্যদের কেউ কেউ ছিলেন মদ-বিক্রেতা। তিনি তাদের মদ ব্যবসা ছাড়ার ব্যাপারে রাজি করাতে পারেননি। এমনই আপাতবিরোধিতার আরেকটা

উদাহরণ ইণ্ডিয়ান মিররে মদের বিজ্ঞাপন।

বাংলায় মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাস্তবে যে খুব সফল হয়েছিল এমন বলা যাবে না। বস্তুত, গোটা উনিশ শতক জুড়ে বাংলায় বেড়েই চলেছিল মদ আমদানি ও বিক্রি। সুফল অবশ্য মিলেছিল ১৯০৬ সালের পর, যখন বাংলার বিভিন্ন জেলায় খোলাভাঁটির বদলে ক্রমশ কেন্দ্রীয় ভাঁটিব্যবস্থা স্থায়ীভাবে চালু করা হয়। তবে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে মদ্যাসক্তি এত হরেকরকমের যে, মিতাচার আন্দোলনের সাফল্যের মূল্যায়ন শুধু আবগারি রাজস্বের পরিসংখ্যানে আটকে রাখা উচিত নয়। সংস্কারকদের সম্পূর্ণ মদ্যপানবর্জনের কর্মসূচি ব্যর্থ হলেও সমাজে মদ্যপান-বিরোধী চেতনা সক্রিয় ছিল। অন্তত, মদ্যপান আর গর্বের বিষয় ছিল না, বরং পানাভ্যাসকে ঘিরে সমাজে তৈরি হয়েছিল একটা পাপ বা অপরাধবোধ।

শুধু সামাজিক আন্দোলন কর্মসূচির মধ্যে আটকে না থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে। আন্দোলনে উঠে এসেছিল এক ধরনের রাজনৈতিক দাবি। সাফল্যও এসেছিল। ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিতর্কের পর বাতিল করা হয়েছিল খোলাভাঁটি ব্যবস্থা। তাই উনিশ শতকের শেষে এসে পালটে যায় আন্দোলনের চরিত্র। ক্রমশ মদ্যপানবর্জন সামাজিক আন্দোলন থেকে বড় রাজনৈতিক আন্দোলনের সামাজিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়।

বিশ শতকের গোড়ায় মিতাচার আন্দোলনের দিশা পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন। নতুন জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার প্রভাবে কর্মসূচির লক্ষ্যে পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক আন্দোলনকে মিলিয়ে দেওয়া হয় জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সঙ্গে। সামাজিক আন্দোলনের উপর নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাব পড়ে। সংস্কারকরা উপলব্ধি করলেন, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রগতিকে সমাজের একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। অন্যদিকে নিম্ন শ্রেণির উপরে উঠে আসা এবং সমাজের নানা ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল, এমন অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিল যা এতদিন নজরই দেওয়া হয়নি। ১৯০৭ সালের এক সভায় ইণ্ডিয়ান সোস্যাল কনফারেন্সের নতুন উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ব্যাখ্যা দেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে কার্যকর করতে হলে এমন ধ্যানধারণা তৈরি করতে হবে, যা তারা তাদের নিজেদের মনে করবে।[২৮] আরও বিস্তৃত পরিসরে আন্দোলনের প্রসার এবং মধ্যবিত্তের পাশাপাশি বা তাদের থেকে খানিকটা সরে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণির জন্য সংস্কারকদের উদ্বেগ রাজনৈতিক দাবি সম্বলিত একটা সামাজিক আন্দোলনকে পরিণত করেছিল বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সামাজিক প্রশ্নে। মিতচার কর্মসূচির জটিলতা বাড়ল, কারণ তা সামাজিক সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে আটকে না থেকে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের শেষে এসে বাংলায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজ সংস্কার প্রায় বন্ধ হয়ে

যায়। বাংলায় সক্রিয় সমাজসংস্কার আন্দোলন স্তব্ধ হওয়ায় আক্ষেপ করেছেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল।[১৯] সক্রিয় সামাজিক সংস্কার থেমে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনবাদ এবং রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উত্থান। পাশ্চাত্য সঙ্গে সমাজসংস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ জেগেছিল রাজনৈতিক বিপিনচন্দ্র পাল আশঙ্কা প্রকাশ করেন, পশ্চিমের দেখানো পথে সমাজসংস্কার করতে না পারলে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত বিদেশি রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ফাঁস চেপে বসবে। ভারতীয় সমাজে ইউরোপীয় রীতি ও প্রতিষ্ঠান চালু হলে তাদের আত্মিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাও অবশ্যম্ভাবী।[২০] আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা এবং ক্রমবর্ধমান বিরোধী আবেগ আদতে জাতীয়তাবাদীদের চিন্তা ও কর্মে পরিবর্তন এনেছিল শতকের শেষে তারা হয়ে ওঠে পুরোপুরি রাজনীতিমনস্ক। ঠিক সেই মুহূর্তে র বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন আকর্ষণ করেছিল বাংলার মানুষের সমস্ত ও আগ্রহ। তবে উনিশ শতকের গোড়া থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত সমাজসংস্কার এবং শেষ পর্বে শুরু হওয়া রাজনৈতিক আন্দোলন উভয়ের নেতৃত্বই যেহেতু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তাই তাদের পক্ষে সমাজসংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া ছিল কঠিন। বরং মিতাচারের সঙ্গে রাজনীতির ভারতীয় রাজনীতিকদের সুবিধাই করে দিয়েছিল। উনিশ শতকের মিতাচার আন্দোলন নতুন প্রজন্মকে দিয়েছিল রাজনৈতিক শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ। আন্দোলনের মধ্য রাজনৈতিক কৌশল রপ্ত করে তারা ক্রমশ হয়ে উঠেছিল রাজনীতিমনস্ক।

অন্যদিকে রাজনৈতিক ভাবনার চাপে মিতাচারের প্রসঙ্গ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জগতে খানিকটা কোণঠাসা হলেও পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। বরং হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদী ভাবনার অংশ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই বিষয়ে শুরু থেকে নজর দিয়েছিল। কংগ্রেস-রাজনীতি ও মিতাচার কর্মসূচির যোগাযোগ ছিল নিবিড়। নীতিগতভাবে কংগ্রেস মিতাচার আন্দোলনের উপর দিয়েছিল বাড়তি গুরুত্ব। প্রচারকরা মিতাচার আন্দোলনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই দেখেছিল। রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ এই আন্দোলনকে রাখা যায় সামাজিক বা নৈতিক সংস্কারের আওতায়। সরাসরি রাজনৈতিক না হয়েও মিতাচার তৈরি করেছিল রাজনীতির মঞ্চ। অধিবেশনের প্রস্তাবে মদ বিক্রির পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী করা হয় মদের জোগানকে। কংগ্রেসের মূল অধিবেশনের পর ইণ্ডিয়ান সোস্যাল কনফারেন্সের অধিবেশন বসত সেখানেও মদ্যপান বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনার পর মিতাচার আন্দোলন প্রস্তাব নেওয়া হয়। এরপর মহাত্মা গান্ধি মদের উপর নিষেধাজ্ঞার কথা বলে শতকের সংস্কারকদের পথেই পা রেখেছিলেন। তার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হল মদ্যপান নিবারণ। রাজনৈতিক চাপ তৈরির হিসেবে ব্যবহৃত হল মদের দোকানের সামনে পিকেটিং। ফলে প্রশাসনও আবগারি নীতির সমালোচনাকে রাজনৈতিক বিষয়সূচি হিসেবেই দেখেছিল, হয়ে উঠেছিল সন্দিহান

এসেছিল প্রশাসনের পীড়ন। কংগ্রেস রাজনীতি এবং মিতচার আন্দোলনকে কিভাবে একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আন্দোলনকারীরা প্রশাসনের কি ধরনের কোপে পড়েছিল তার বর্ণনা লুসি ক্যারল দিয়েছেন ইলাহাবাদের অযোধ্যাবিহারী লালের ঘটনা প্রসঙ্গে।[২২] মিতাচার রাজনীতির আরেকটা দিক বা পক্ষ ছিল জাতপাতের রাজনীতি। দলিত নিম্নবর্গকে হিন্দু ধর্মের মূলধারায় আনতে উচ্চবর্ণের সংস্কারকরকরা মিতাচারসহ নানা সামাজিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। মিতাচারকে ঘিরে তৈরি হয় রাজনীতির জটিল আবর্ত। তবুও একটা মৌলিক প্রশ্ন থেকেই যায়। রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের কোন জাতীয়তাবাদী চেষ্টা ছিল কি? নাকি আশু রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত শুধু স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হয়েছিল।

তথ্যপঞ্জি

১ জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার, *সুধা না গরল* (কলিকাতা, ১৭৯২ শকাব্দ) পৃ. ৫

২ জয়ন্ত গোস্বামী, *সমাজ চিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন* (সাহিত্য শ্রী, কলিকাতা, ১৯৭৪) পৃ. ১০৫

৩ Tapankumar Roychaudhuri, *Europe Reconsidered* (OUP, New Delhi, 2002) p. 30

৪ গোলাম মুর্শিদ, *সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* (১৮৫৪-১৮৭৬) (বাংলা একাদেমি, ঢাকা, ১৯৮৪) পৃ. ৩৬৪

৫ শম্ভুনাথ বিট, *উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন*, পৃ. ২২১

৬ The Hindu Patriot, 29 February 1864

৭ গৌরগবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), *আচার্য কেশবচন্দ্র* (পরিতোষ ঘোষ, কলিকাতা, ১৯৩৮) পৃ. ৭২৫

৮ Dipesh Chakrabarty, *Sasipada Banerjee: A study in the nature of the first contact with the Bengali Bhadraloks with the working classes of Bengal*, The Indian Historical Review, Vol.-II, No.- 2. January 1976.

৯ Financial Proceedings No. File E 1-0/2 (1), Appendix B, February 1889, Financial Department (Excise), Government of Bengal (WBSA)

১০ Financial Proceedings No. 10/11, February 1887, Financial Department (Excise), Government of Bengal (WBSA)

১১ Pradip Sinha, (ed. Narendra Krishna Sinha) *History of Bengal (1757-1905)* (University of Calcutta Press, Calcutta, 1967) P.-406

১২ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী* (কলিকাতা, ১৮৯৮, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬২) পৃ. ৮। ২৬৬-২৬৭

১৩ Narendranath Qanungo. *The Renascent Bengal art the Cross-Roads*, P. 58

১৪ প্রিয়নাথ লাহিড়ী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী*, সংখ্যা ২৫ (প্রকাশনা কাল ও স্থান
পৃ. ৩১

১৫ বিস্তারিত তথ্যের জন্য উল্লিখিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সাহিত্য-সাধক-*চরিতমালা* (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)

১৬ রামনারায়ণ তর্করত্নের *চক্ষুষ্মানে নিকুঞ্জ*, *সুধাকর বিষময়ে তেজেন্দ্র*, দীনবন্ধু মিত্রের *একাদশীতে নকুলেশ্বর ও নিমচাঁদ*

১৭ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনে ভিক্টোরীয়ান প্রভাব* (স্বপন বসু, ইন্দ্রজিত চৌধুরী সম্পাদিত *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*) (কলিকাতা, ...) পৃ. ১১৭

১৮ Indian Social Reformer, 12 January 1908 দ্রষ্টব্য Charles H. Heimsath, *Indian Nationalism and Hindu Social Reform* (OUP, Bombay, 1964) P.-337

১৯ Charles H. Heimsath, *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, P. 263-264

২০ Bipin Chandra Pal, *Memoirs of My Life and Times in the Days of My Youth (1857-1884)* (Modern Book Agency, Calcutta, 1932) P. 263

২১ V. Ramakrishna, *Social Reform in Andhra, 1848-1919* (Vikas, New Delhi, 1983) P. 148

২২ Lucy Carroll, *The Temperance Movement in India: Politics and Social Reform* (Modern Asian Studies, Vol. 10, No. 3, 1976)

রক্তিম সুর বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও হেরম্বচন্দ্র কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক। আগ্রহের বিষয়— উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস। বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত।

ই তি হা স

শতবর্ষের আলোয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

রক্তিম সুর

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ, কলকাতা

৯ জানুয়ারি ১৯১৫, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। একুশ বছরের দীর্ঘ প্রবাসকাল, কিন্তু ছিন্ন হয়নি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ। এস. আরাবিয়া জাহাজ বোম্বাইয়ে পৌঁছালে বেশ কিছু স্থানীয় মান্যগণ্য ব্যক্তি গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে ডিঙি চেপে পৌঁছে যায় তাঁকে স্বাগত জানাতে। তবুও গোপালকৃষ্ণ গোখলের বিচারে, তিনি দেশীয় বিদেশি (native foreigner), কারণ তাঁর রাজনৈতিক দর্শন দানা বেঁধেছিল ভিন দেশে। সেখানেই হয়েছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের হাতেখড়ি। এদেশে ফিরে কয়েক বছরের অপেক্ষা, বুঝে নেওয়া দেশীয় রাজনীতির হালচাল। তারপর হাল ধরলেন জাতীয় রাজনীতির। শুরু হলো আন্দোলনের নতুন ধারা, যা প্রচলিত সমস্ত রাজনৈতিক ভাবনা থেকে একেবারে আলাদা।

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজীর এই আবির্ভাবকে অসামান্য ব্যঞ্জনাময় বাক্যে তুলে ধরেছেন জওহরলাল নেহেরু তাঁর গ্রন্থ *The Discovery of India*-তে। লিখেছেন: "তিনি ছিলেন টাটকা বাতাসের একটা প্রবল প্রবাহের মতো, আমাদের জাগিয়ে দিলেন, গভীর শ্বাস নিলাম আমরা।"[১] বহু বছর পর অশীন দাশগুপ্তের মূল্যায়নও বিশেষ আলাদা কিছু নয়। সেসময়ের প্রেক্ষিতে গান্ধিজী জড়ভরতের হরিণ।[২] বাস্তবিকই তিনি যখন ভারতে ফেরেন, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি তখন খানিকটা গতি হারিয়েছে। নরমপন্থা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম—দুই ধারা নিয়েই মানুষ আশাহত। এদিকে গান্ধিজী নিজেও প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায়। তবু তাঁর উপস্থিতি ও অভিনব ভাবনা জাতীয় আন্দোলনের স্তিমিত প্রবাহে আনল জোয়ার। তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মায় আলোড়িত হলো গোটা দেশ। গান্ধিজীর অভিনবত্ব হলো—ব্যক্তিগতভাবে প্রচলিত দুই ধারার কোনোটাকেই গ্রহণযোগ্য মনে না করলেও তিনি জাতীয় আন্দোলনের পরিসরে দুই ধারাকেই বেঁধে ফেললেন এক সূত্রে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সফলভাবে পরীক্ষিত অসহযোগের পথ আকর্ষণ করেছিল চরমপন্থীদের। অন্যদিকে, দাবির নিরিখে সেই মুহূর্তে গান্ধিজী ছিলেন নরমপন্থী। কারণ, তখনো তিনি স্বরাজের কথা বলেননি। তবে শুরু থেকেই তিনি লক্ষ্যে স্থির, এমন আন্দোলনেই যোগ দেবেন যা সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নেবে সত্যাগ্রহকে। আসলে ঠিক হাতিয়ারও নয়, সত্যাগ্রহ তাঁর জীবনদর্শন, ধর্মের সমতুল্য।

অসহযোগ আন্দোলন বা গান্ধিজীর যেকোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির আলোচনায় অত্যন্ত জরুরি তাঁর অহিংসা সত্যাগ্রহের দর্শনকে বুঝে নেওয়া। অহিংসা সত্যাগ্রহের আদর্শকে তিনি বারবার যাচাই করে নিয়েছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন হৃদয় দিয়ে। শুধুমাত্র এই কারণেই তাঁকে একজন নিছক রাজনীতিবিদ বলা যাবে না। তাঁর জীবনের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুখ্য হয়ে উঠেছিল সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। এর একটা অন্যতম উদাহরণ—১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের জয়লাভের পর তাঁর মন্তব্য। তিনি বলেন: "আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রথম থেকেই আমি তাঁর পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম।... আমার চেষ্টাতেই ডঃ পট্টভি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াননি। অতএব এ পরাজয় তাঁর অপেক্ষা আমারই অধিক।"[৩] এই সুভাষ-বিরোধিতার জন্য গান্ধিজী বাঙালির কাছে প্রবল সমালোচিত হলেও এই স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট, তিনি কোনো ছলের আশ্রয় নেননি। মনে হতে পারে, বিষয়টাকে তিনি ব্যক্তিগত স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে, তিনি দায় এড়ানোর চেষ্টা করেননি। গান্ধিজী ভুল করেছিলেন, ব্যর্থও হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি ভণ্ড ছিলেন না।

গান্ধিজীর অহিংসা সত্যাগ্রহের আদর্শ নানা ভাবনা ও দর্শনের সমন্বয়। একদিকে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল এমার্সন থুরোর 'Civil Disobedience', লিও টলস্টয়ের

'The Kingdom of God is within you', আবার অন্যদিকে তিনি আস্থা রেখেছেন ভারতীয় দর্শনে। সেইসঙ্গে মিশিয়েছেন তাঁর নিজস্ব ভাবনা। তাঁর কাছে সত্যাগ্রহ হলো সত্যের সর্বোচ্চ ধারণা থেকে উৎসারিত বিশুদ্ধ আত্মশক্তি। এই শক্তি যেকোনো অন্যায় থেকে মানুষকে বিরত রাখবে, শান্ত রাখবে সকল প্ররোচনায়। অন্যায়ের প্রতিরোধ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সত্যাগ্রহী কখনই অন্যকে নিপীড়ন করবে না। নিজে ক্লেশ সহ্য করে অন্যায়কারীর চেতনা জাগাতে চেষ্টা করবে। অহিংসা এবং ভালবাসা দিয়ে প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করে সত্যাগ্রহী পৌঁছাবে নিজের লক্ষ্যে। ভয়, ঘৃণা, মিথ্যাচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকাই হবে প্রকৃত সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য। এখানেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সঙ্গে সত্যাগ্রহের পার্থক্য। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে শত্রুর প্রতি কোথায় যেন মনের গহীনে থেকে যায় একধরনের হিংসা, যা গান্ধিজীর বিচারে মানুষের দুর্বলতা। তাই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দুর্বলের অস্ত্র, একটা রাজনৈতিক কৌশলমাত্র। অন্যদিকে সত্যাগ্রহে চলতে থাকে মনের ধারাবাহিক ক্ষালন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি তাকে করে তোলে সবলের অস্ত্র, পৌঁছে দেয় পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্ত স্তরে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ বিবিধ। অসহযোগ তার মৃদু রূপ, আর চরম ও শক্তিশালী সত্যাগ্রহ হলো আইন অমান্য।

তাঁর নৈতিক লড়াইয়ের অন্যতম ভিত্তি সত্যাগ্রহ। গান্ধিজী আজীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন এই নৈতিকতা নিয়ে। সুতরাং সত্যাগ্রহও কোনো স্থবির, একমুখী তত্ত্ব নয়। তাঁর মতে, সত্যাগ্রহীকে হতে হবে নমনীয়, উদার। নিজের উদ্দেশ্যকে যাচাই করে নিতে হবে একাধিকবার। মানতে হবে যে, তার বিশ্বাসই চূড়ান্ত নয়। বিরুদ্ধ মতেও আছে অন্য এক সত্য। দুই আংশিক সত্যের মধ্য থেকে উঠে আসবে পূর্ণ সত্য। এই লড়াইয়ে কোনো পক্ষই বিজয়ী বা বিজিত নয়। শুধু শেষে পৌঁছানো যায় একধরনের উন্নততর নৈতিক মানে। চলতেই থাকে এই প্রক্রিয়া। বিষয়টা অনেকটাই মার্ক্সীয় 'thesis & anti-thesis' দ্বন্দ্বের মতো, যা থেকে তৈরি হয় 'synthesis'। আবার সেই 'synthesis'-র মধ্যে শুরু হয় নতুন দ্বন্দ্ব। গান্ধিজীর এই অহিংসা সত্যাগ্রহের দর্শনই তৈরি করল জাতীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি। তাঁর আগে জাতীয় আন্দোলনের কোনো নেতাই রাজনৈতিক তত্ত্ব ও কৌশলকে এমন স্পষ্টভাবে তুলে ধরে কিছু লেখেননি। শুরু থেকেই গান্ধিজীর লক্ষ্য ছিল ব্যাপক গণ-আন্দোলন। তবে অহিংস সত্যাগ্রহকে শুধু তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক কৌশল মনে করলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তাঁর নীতির বিশ্লেষণ। তিনি মনে করেছিলেন, অহিংস সংগ্রামের পথ নিশ্চিত করবে আন্দোলনে আমজনতার যোগদান। বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের মতো দেশে সাধারণ মানুষ সহিংস আন্দোলনে তেমন স্বচ্ছন্দ নয়। নারীরাও উৎসাহী হবে অহিংস সংগ্রামে যোগ দিতে। ব্রিটিশের প্রবল পরাক্রম সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অহিংসাও সবলের অস্ত্র—নিরস্ত্র মানুষের নিরুপায় বিকল্প নয়। বরং রাজনৈতিক শক্তিতে অহিংসা হয়ে উঠবে সশস্ত্র ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সমতুল। আন্দোলনে সামান্য হিংসার প্রকাশ ঘটলে সরকার পেয়ে যাবে ব্যাপক দমনপীড়ন চালানোর ন্যায্যতা। সেই অসহনীয় দমনপীড়ন মনোবল ভেঙে দিয়ে মানুষকে করে তুলবে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয়। সুতরাং, তীব্রভাবে সমালোচিত হলেও গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত শুধু তাঁর আদর্শের সঙ্গেই সাযুজ্য রাখেনি, রাজনৈতিক কৌশলের দিকটাও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে অহিংস সত্যাগ্রহ সরকারকে ফেলবে উভয়সংকটে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমনে বলপ্রয়োগকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা কঠিন। আবার সরকার যদি কোনো পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করে, তবে নিশ্চিতভাবে খানিকটা আধিপত্য হারাবে, কমবে শাসনের শক্তি। সুতরাং সবদিক দিয়েই সত্যাগ্রহ সুনিশ্চিত করবে শাসকের নৈতিক পরাজয়।

এই সত্যাগ্রহের পথ ধরেই তিনি পৌঁছাবেন স্বরাজের লক্ষ্যে। গান্ধিজীর স্বরাজের অর্থ কিন্তু শুধু রাজনৈতিক নয়, কেবলমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্র বা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নয়; স্বরাজ বলতে তিনি বুঝতেন আবেগের নিয়ন্ত্রণ। উনিশ শতকের ইংরেজ লেখক থমাস কার্লাইল এবং জন রাস্কিনের চিন্তার সূত্র ধরে তিনি জোর দিলেন আত্মবিশ্বাস ও স্বাবলম্বনের ওপর। অর্থাৎ স্বরাজের দাবি করতে হলে তার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

সত্যাগ্রহ কর্মসূচিকে সফল করতে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মা বা ভাবমূর্তি। ১৯১৫ সালের শুরুতেই গান্ধিজী বুঝে গিয়েছিলেন, কংগ্রেস

তাঁর সত্যাগ্রহ কর্মসূচিকে সহজে স্বীকৃতি দেবে না। সেই মুহূর্তে কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃবৃন্দকে এড়িয়েও কিছু করা সম্ভব নয়। তাই তিনি নজর দিলেন আমজনতার ওপর, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে চালালেন শোষণের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের সফল পরীক্ষা। এখানেই ব্যবহার করলেন তাঁর ক্যারিশ্মা। সতীনাথ ভাদুড়ি তাঁর ঢোঁড়াই চরিত মানস-এ অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গান্ধিজীর সেই জনমোহিনী ভাবমূর্তি। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সাফল্যের কথা শুধু শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে এসে পৌঁছায়নি, জেনেছিল সাধারণ মানুষও। তাই হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় এসে মানুষ ভিড় জমিয়েছিল গান্ধি-দর্শনে। গান্ধির ব্যক্তিত্বের বর্ণনায় গোখলে বলেছিলেন, তাঁর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির ছোঁয়ায় সাধারণ মানুষ পরিণত হলো নায়কে এবং শহিদে।[৪] প্রত্যন্ত গ্রামেও তাঁর জনপ্রিয়তা অবাক করেছিল ইংরেজ সরকারকে। ১৯২১ সালে এলাহবাদ কৃষক আন্দোলন সংক্রান্ত সি. আই. ডি. প্রতিবেদনে লেখা হলো—কেউ জানে না তিনি কে বা কী, কিন্তু তিনি যা বলেন বা আদেশ করেন তা অবশ্য-পালনীয়।[৫] সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং কংগ্রেসের সংগঠন ও শৃঙ্খলার চাপে অবশ্য খানিকটা ম্লান হয়েছিল গান্ধিজীর নামের এই মহিমা। বিপান চন্দ্র আবার আমজনতার ওপর গান্ধিজীর জীবনদর্শনের সীমিত প্রভাব দেখেছেন।[৬] রাজনৈতিক নেতা হিসাবে রাজনৈতিক লড়াইয়ের কৌশলকে কাজে লাগিয়েই তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করে তুলেছিলেন। প্রকৃতই সাধারণের কাছে গান্ধিজীর আদর্শের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল তাঁর ত্রাণকর্তার ভাবমূর্তি। তাঁদের স্লোগান ছিল—'গান্ধি মহারাজ কী জয়' বা 'মহাত্মা গান্ধি কী জয়'। এই স্লোগান তুলে সুর্মা উপত্যকার চা-বাগানের শ্রমিকরা বা কলকাতার কাঁসারিরা যেমন মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলে ধর্মঘট ডেকেছিল, তেমনি নোয়াখালি, ত্রিপুরার কৃষকরা অস্বীকার করেছিল খাজনা দিতে। অথচ এসব আন্দোলন গান্ধিজীর ডাকে হয়নি বা তাঁর বিশেষ সমর্থনও ছিল না। এমনই ছিল 'গান্ধি' নামের মহিমা!

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব দিয়েও কিন্তু গান্ধিজীর অহিংসা সত্যাগ্রহের দর্শনকে অস্বীকার করা যায় না। তাঁর রাজনৈতিক ধারণায় মিশেছিল দর্শন ও বাস্তববোধ। যেকোনো রাজনৈতিক সক্রিয়তার মূলে ছিল অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ—যে-আদর্শ সামাজিক সংঘাত, জাতীয় সংগ্রাম সবকিছুর মধ্যে এনেছিল সংহতি। সত্যাগ্রহের একটা স্পষ্ট মতাদর্শ ও তার বাস্তব প্রয়োগের সাফল্য নিয়েই গান্ধিজী দেশে ফিরেছিলেন, তবু রাজনৈতিক গুরু গোখলের পরামর্শে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তখনি যোগ দেননি। দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন দেশ ও তার মানুষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য। দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে চলল সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাজ। চম্পারণ, আমেদবাদ, খেদায় সফল হলো সত্যাগ্রহের স্থানীয় পরীক্ষা। ভারতবর্ষের কৃষক-শ্রমিক সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করায় প্রসারিত হলো তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই তিনটি আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের সাহায্য নেননি তিনি। প্রমাণিত হয়েছিল দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁর দক্ষতা। উন্মুক্ত হয়েছিল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশের পথ।

অনেকদিন ধরে গান্ধিজী সীমিত ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তিনি চাইছিলেন সর্বভারতীয় কোনো দাবিতে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ। রাওলাট আইন তাঁকে সেই সুযোগ করে দিল। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত হলো সত্যাগ্রহ সভা। জাতীয় আন্দোলনে সত্যাগ্রহ ছিল সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি, ভারতীয় রাজনীতিতে অজ্ঞাত। তাই সত্যাগ্রহ ঘিরে জমেছিল অনেক সংশয়। ৬ এপ্রিল শুরু হওয়া রাওলাট সত্যাগ্রহ গান্ধিজী প্রত্যাহার করে নেন ১৮ এপ্রিল। রাওলাট আইন প্রত্যাহারে তিনি সরকারকে বাধ্য করতে পারেননি। নৈতিক শক্তির ওপর নির্ভর করলেও ব্যর্থ হয়েছিলেন হিংসা এড়াতে। অহিংসার আদর্শে যথাযথ প্রশিক্ষিত না করে মানুষের হাতে সত্যাগ্রহের মতো অস্ত্র তুলে দেওয়ার ভুল গান্ধিজীও স্বীকার করেছিলেন।

রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে ব্যর্থ হলেও নজরে এড়ায় না গান্ধিজীর প্রতি প্রবল গণসমর্থন। ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি একটা ক্ষুদ্র শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে পরিণত হলো গণ-রাজনীতিতে। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে ঐ সময়ের গান্ধিবাদী গণ-আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও। সর্বভারতীয় আন্দোলন হলেও প্রভাব বেশি ছিল শহুরে এলাকায়। যথেষ্ট পরিমাণে গণ-সচেতনতা এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের অভাব ছিল স্পষ্ট। ফলে আন্দোলনে যোগ দেওয়া মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

দাঁড়িয়েছিল স্থানীয় বিষয়গুলো। তখনো কংগ্রেস সংগঠন তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তিনি নির্ভর করেছিলেন স্থানীয় নেতৃত্বের ওপর। তাদের জনপ্রিয়তা বা স্থানীয় সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ কিংবা গান্ধিবাদী মতাদর্শে বিশ্বাস—সবকিছু একইরকম পোক্ত ছিল না। মানুষের আবেগের ওপর এই নেতাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণেই অহিংসা সত্যাগ্রহে দেখা দিয়েছিল বিচ্যুতি। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে শুধুমাত্র এই স্থানীয় নেতাদের ওপর নির্ভরতা যথেষ্ট ছিল না। এই ব্যর্থতা থেকে গান্ধিজী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার আগে উপলব্ধি করলেন কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক সংগঠনের।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদদের সংশয় ছিল অসহযোগ কর্মসূচি নিয়ে। গণ-আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁদের কাছে গান্ধিজীর প্রস্তাব ছিল অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার সামিল। কিন্তু গান্ধিজী ছিলেন নিজের আদর্শ ও কৌশলে অবিচল। তাঁর মনে হয়েছিল, অহিংস অসহযোগই মানুষকে আরো সংঘবদ্ধ করবে। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার সুবাদে তাঁর এই প্রত্যয় হয়েছিল দৃঢ়। দাবি করেছিলেন, একমাত্র এই পথেই জাগানো যাবে ব্রিটিশের চেতনা। সহজ হবে স্বাধীনতার পথ। বস্তুত, ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এছাড়া আর কোনো পথও নেই বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর, কারণ তা হিংসামুক্ত।[৭] ভালবাসা ও যুক্তির জোরে মানুষের ধ্যান-ধারণার বদল ঘটিয়ে তিনি স্বরাজ অর্জন করতে চেয়েছিলেন।

অহিংসা অসহযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৮] শুধু প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ হিংসা বা হিংসার পরিবেশ সৃষ্টিও অসহযোগের আদর্শবিরোধী। এমনকী, শেষ অবলম্বন হিসাবেও হিংসার আশ্রয়ে যাওয়া যাবে না। হিংসার আশঙ্কাতেই তাঁর অসহযোগের কর্মসূচি থেকে বাদ পড়েছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। তিনি চাননি এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে কেউ হিংসায় জড়িয়ে পড়ুক। তাই খিলাফতিদের তিনি বুঝিয়েছিলেন অস্ত্রের অসারত্ব। অস্ত্রের লড়াইয়ে পরাজয়ে আছে অপমানের যন্ত্রণা। কিন্তু অস্ত্র যদি হয় আত্মশক্তি, তাহলে প্রতিপক্ষের নৈতিক জয় মেনে নিতে যেমন কোনো অপমান নেই, তেমনি সে-জয়ে নেই কোনো বিজয়ীর উল্লাস। তাই অহিংস অসহযোগের মাধ্যমে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে প্রতিপক্ষের ওপর। একইসঙ্গে তিনি অসহযোগের এই শক্তির অপব্যবহার সম্পর্কেও শুনিয়েছেন সাবধানবাণী।

অসহযোগের অন্যতম শর্ত আচরণে সংযম ও শৃঙ্খলা। গান্ধিজী ছিলেন যেকোনো ধরনের পীড়নমূলক সামাজিক নির্বাসনের ঘোর বিরোধী। এই সূত্রে অসহযোগের রাজনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে তিনি জুড়ে দিলেন সামাজিক সমস্যা। তিনি বললেন, আত্মশুদ্ধি না হলে অসহযোগের প্রকৃত যোদ্ধা হওয়া যাবে না। হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা এই আত্মশুদ্ধির পথে বাধা। অসহযোগের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ভারতীয় সমাজের সমস্ত অংশের সক্রিয় যোগদান। অস্পৃশ্যতা থেকে গেলে অধরা থেকে যাবে সামাজিক ঐক্য। অসহযোগের মাধ্যমে দূর হবে সমস্ত ধরনের দুর্বৃত্তি ও তার কারণ। দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে বারবার পরীক্ষার মুখে পড়বে মানুষের সততা ও সামর্থ্য। নিজেদের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে মানুষ হবে নম্র। অসহযোগে দম্ভ, প্রবঞ্চনার কোনো স্থান নেই, আছে সত্যের কাছে আত্মনিবেদন। এইভাবে অসহযোগে মূর্ত হলো গান্ধিজীর আধ্যাত্মিক দর্শন। সত্য হলো জীবনের চূড়ান্ত বাস্তবতা। তাই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, হিংসার তো নয়ই। সত্যাগ্রহের শাখা হিসাবে অসহযোগ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অবলম্বন করবে সমস্ত ধরনের অহিংস প্রতিরোধ।

গান্ধিজী অসহযোগকে সংগঠিত করেছিলেন তাঁর সত্যাগ্রহের ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে। তাই সচেতনভাবেই বেছে নেননি আইন অমান্যের মতো চরম কোনো পথ। তাঁর ব্যাখ্যায় অসহযোগ শুধুমাত্র নীতিভ্রষ্ট ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমস্ত সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নেওয়া।[৯] আইন অমান্যের আগে সরকারের আইনের ত্রুটিপূর্ণ চরিত্রকে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন; যা সম্ভব একমাত্র নির্বাচিত কিছু মানুষের পক্ষেই। তাই আইন অমান্য প্রথমেই আমজনতার আন্দোলনের পদ্ধতি হতে পারে না। তাদের জন্য নিরাপদ হলো অসহযোগ। এই অসহযোগিতা নানা উপায়ে হতে পারে। হরতাল, বয়কট, কর্মবিরতি ইত্যাদি যেকোনোটাই শান্তিপূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষের অনৈতিক কাজের বিরোধিতা করার চমৎকার উপায়। সঙ্গে ছিল সেগুলো অপব্যবহার না করার সতর্কবার্তা। অসহযোগ আন্দোলনকারী অধৈর্য, অস্থির,

প্রতিহিংসাপরায়ণ হলেই লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রয়োগ করবে হিংসা। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁর অস্ত্র হবে সত্যাগ্রহ। আত্মসংযমে ছিল গান্ধিজীর গভীর বিশ্বাস। অসহযোগে অংশগ্রহণকারীর প্রতি তাঁর উপদেশ—চলনে-বলনে বজায় রাখতে হবে সংযম। আন্দোলনে যোগদান যা খুশি করার ছাড়পত্র দেয় না। বরং আরোপ করে নানা নিয়ন্ত্রণ। অহিংস অসহযোগের কার্যকারিতায় বিশ্বাস রেখে আন্দোলনকারী স্বেচ্ছায় আন্দোলনে যোগ দেবে। স্বেচ্ছাসেবীরা প্রস্তুত থাকবে চরম আত্মোৎসর্গের জন্য, যা নিশ্চিত করবে আন্দোলনের সাফল্য। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অসহযোগে গান্ধিজী যে অহিংসা সত্যাগ্রহের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তা পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলনের ক্ষেত্রেও থেকে গিয়েছিল একইভাবে প্রাসঙ্গিক।

গান্ধিজীর অসহযোগের ডাক কোনো তাৎক্ষণিক সীমিত লক্ষ্যের রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। তিনি চেয়েছিলেন সবদিক দিয়ে ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন। তাই অসহযোগের ধারণায় কোনো ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের কথা বলা হয়নি। নেই কোনো বশ্যতার ধারণাও। অসহযোগে অংশগ্রহণকারী মর্যাদা দেবে অন্যের অধিকারকে। তাঁর মতে, পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে সাফল্য আসবে না। তাই বিশ্বাস, চিন্তা, চেতনা ও কর্মের যে স্বাধীনতা আমরা নিজেদের জন্য দাবি করি, অন্যদের জন্যও তা সমানভাবে স্বীকার করতে হবে।[১০] অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রতিপক্ষের প্রতি নম্র হওয়া অসহযোগকারীর কর্তব্য।

প্রতিপক্ষের মোকাবিলার পদ্ধতিও গান্ধিজী বাতলে দিয়েছিলেন। সরকার অত্যাচারী হলে তার পীড়নের বিরোধিতা করা প্রজার দায়িত্ব ও কর্তব্য। অসহযোগের অর্থ হলো সেই পীড়নের অংশ না হওয়া এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই পীড়নকে সমর্থন না করা। মানুষের স্বার্থরক্ষা সরকারের কর্তব্য। সে-কাজে ব্যর্থ হলে প্রজার আনুগত্য দাবি করার অধিকার সরকার হারাবে। যতই শক্তিশালী হোক না কেন, প্রজাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণের অধিকার সরকারের নেই। পাপের সঙ্গে পুণ্যের, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের যেমন কোনো সহযোগিতা থাকতে পারে না, অত্যাচারী সরকারের সঙ্গেও প্রজার বিরোধিতার সম্পর্ক। প্রজা প্রত্যাখ্যান করলে সরকারের কুনীতিও টিকে থাকতে পারবে না।

গান্ধিজীর অহিংসা সত্যাগ্রহের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও অসহযোগের কর্মসূচি কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে একেবারে নতুন ছিল না। বিপিনচন্দ্র পাল, লোকমান্য তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ এই ধরনের অসহযোগিতার কথা বলেছিলেন গান্ধিজীর আগেই। তবে সেসবই ব্যক্তিগত স্তরে। অসহযোগের নেতিবাচক কর্মসূচির খানিকটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গের সময়ই। গান্ধিজীর অভিনবত্ব হলো—তিনি অসহযোগকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক না রেখে পরিণত করেছিলেন সুসম্বদ্ধ গণ-আন্দোলনে। বস্তুত, মহাবিদ্রোহের পর এমন গণ-অভ্যুত্থান ভারতবর্ষ দেখেনি।

আন্দোলনের জন্য তাঁর লক্ষ্য ছিল যুবসম্প্রদায়। কারণ, তারাই সরকারের নীতির শিকার হয়েছিল সচেতনভাবে কিংবা অজ্ঞাতে। প্রচলিত শিক্ষায় তারা হারাচ্ছে আত্মনির্ভরতা, হয়ে পড়ছে অত্যাচারীর সহযোগী এবং অংশীদার। সরকারের অশুভ উদ্দেশ্যের মোকাবিলা করতে হলে যুবসম্প্রদায়ের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। ১৯২০ সালের ২৭ নভেম্বর বেনারসে ছাত্রদের সামনে এক বক্তৃতায় গান্ধিজী এই আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছিল ছাত্রসমাজ। প্রথম দিকে সরকারি স্কুল-কলেজে ছাত্রসংখ্যা কমেছিল যথেষ্ট। কিন্তু প্রাথমিক উন্মাদনা থিতিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল ১০%-এর বেশি ছাত্র সরকারি স্কুল-কলেজ ছাড়েনি।* এই কর্মসূচি নিয়ে বিতর্কও কম ছিল না। চিত্তরঞ্জন দাশ যখন ঘোষণা করলেন—‘শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ নয়’, তখন ‘মডার্ন রিভিউ’-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উত্তর দেন: “যেন পূর্ণ শিক্ষাবিহীন স্বরাজ একবছরে লাভ করা যায় বা একদিনের জন্য রক্ষা করা চলে!”[১১] এভাবে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মনে করেছিলেন নিছক শূন্যতার নৈরাজ্য। কিন্তু অবিচলিত গান্ধিজী উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন সরকারি ইংরেজি শিক্ষার আগাছা।

ছাত্র-যুবদের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো শ্রেণি-সংঘাত না থাকায় তাদের নিয়ে তেমন সংশয় গান্ধিজীর ছিল

* সারা ভারতে আর্টস কলেজের ছাত্রসংখ্যা ১৯১৯-এ ছিল ৫২,৪৮২; ১৯২১-২২-এ তা কমে দাঁড়ায় ৪৫,৯৩৩।

না। কিন্তু যাদের বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে গণ-আন্দোলনের সাফল্য অসম্ভব, সেই কৃষক-শ্রমিকদের শ্রেণি-সংঘাত গান্ধিজীকে রেখেছিল সংশয়ে। জাতীয় সংগ্রামের পাশাপাশি তারা শ্রেণি-লড়াইকেও নিশ্চিতভাবে সামনে নিয়ে আসবে। তাই তাদের মধ্যে হিংসার সামান্যতম বহিঃপ্রকাশও ডেকে আনতে পারে বড় ধরনের সংকট। শুধু ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধেই নয়, এই হিংসার প্রয়োগ ঘটতে পারে দেশীয় জমিদার-মালিকদের ক্ষেত্রেও, যা গৃহযুদ্ধের নামান্তর। এরকম একটা আশঙ্কা হয়তো গান্ধিজীর ছিল। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন, যে-আমজনতাকে তিনি জাতীয় সংগ্রামে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রশিক্ষিত বা পরীক্ষিত নয় অহিংসা সত্যাগ্রহের আদর্শে। তাই 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-তে (১৫ জুন ১৯২১) 'আসামের শিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি ধনিক-শ্রমিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন; জোর দিয়েছিলেন জমিদার-কিষাণ ঐক্যের ওপর।[১২] অনেকে অভিযোগ তোলেন, গান্ধিজী শ্রেণিশোষণ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন। আসলে গান্ধিজী জাতীয় সংগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন সামাজিক স্থিতি। অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি জয় করেছিল কৃষক-শ্রমিকের নিঃশর্ত আনুগত্য। গান্ধিজীর ডাকে সারা ভারতে যে আবেগের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, তার পিছনে ছিল এক ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা। গান্ধিরাজ স্থাপিত হয়েছে এবং সব শোষণের অবসান হবে—এই রটনায় আসামের চা-বাগানের শ্রমিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দলে দলে দেশে ফিরে চলল অনুমতি ছাড়াই। ১৯২১-এর ডিসেম্বর ও ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে অন্ধ্রের গুন্টুরের কৃষকরা আশা করেছিল—গান্ধিরাজ এলে খাজনা দিতে হবে না। মানুষের এতটাই বিশ্বাস ছিল গান্ধিজীর ওপর।

শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল অসহযোগের সূত্র ধরেই। শ্রমিক আন্দোলন চলেছিল অসহযোগের সমান্তরালে। ১৯২০-২১-এর মধ্যে কলকাতার আশপাশে তীব্র হয়েছিল শ্রমিক অসন্তোষ। জেসপ, বার্ড, বার্ন, অ্যান্ড্রু ইয়ুল ইত্যাদি বিদেশি মালিকানাধীন কারখানায় শুরু হলো ধর্মঘট। ১৯২০-তে শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা ছিল ৪০; ১৯২২-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫। গান্ধিবাদী শ্রমিক নেতারা আন্দোলনের রাশ ধরে রাখার চেষ্টা করলেও দাঙ্গা বাধল কয়েক জায়গায়। কৃষকের এই সংগ্রাম ক্রমশ হয়ে উঠল হিংসাত্মক। রাজশাহি, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, রংপুর, চট্টগ্রাম, রায়বেরিলি, চম্পারণ, মুজঃফরপুর ইত্যাদি নানা জায়গায় জমিদার-মহাজনের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হাট ও ভেড়ি লুঠ, বনসম্পদের ক্ষতি, সামাজিক বয়কটের মাধ্যমে দেখা দিল বিক্ষিপ্ত হিংসা। আর সবচেয়ে বড় ঘটনাটা ঘটে গেল গোরক্ষপুরের চৌরি-চৌরায় (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। তাদের নেতা ভগবান আহিরের ওপর অত্যাচার ও পুলিশের গুলিচালনার প্রতিশোধ নিতে জনতা থানা আক্রমণ করে পুড়িয়ে মেরেছিল ২২ জন পুলিশকে। পুলিশি প্ররোচনা থাকলেও সত্যাগ্রহের স্বেচ্ছাসেবীদের এমন আচরণ গান্ধিজী বরদাস্ত করতে পারেননি। ১৯২২-এর ১২ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গণ সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে যবনিকা নামল অসহযোগে। ■

তথ্যসূত্র

১ Nehru, Jawaharlal, *The Discovery of India*, New York, 1959, p. 274

২ দ্রঃ দাশগুপ্ত, অশীন, 'জড়ভরতের হরিণ: গান্ধী ও কংগ্রেস', 'দেশ', কংগ্রেস সংখ্যা, ১৯৮৫, পৃঃ ৫২

৩ Namboodiripad, E. M. S., *A History of Indian Freedom Struggle*, Social Scientist Press, Trirvandrum, India, 1993, p. 394

৪ দ্রঃ Singh Dewal, Onkar, *M K Gandhi: The Educationist Par Excellence*, New Delhi, 2015, p. 25

৫ দ্রঃ Kumar, Kapil, *Peasants' Perception of Gandhi and His Programme: Oudh, 1920—1922*, Social Scientist Press, Feb.1983, vol. II, no. 2, pp. 16—30

৬ দ্রঃ Chandra, Bipan, *Indian National Movement: The Long-term Dynamic*, Har Anana, New Delhi. 2008, p. 32

৭ দ্রঃ *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi, 1965, vol. XVII, p. 75

৮ দ্রঃ *Ibid.*, p. 439

৯ দ্রঃ *Ibid.*, p. 466

১০ দ্রঃ *Ibid.*, P. 104

১১ দ্রঃ ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৩, পৃঃ ১০৩

১২ দ্রঃ ফৈজাবাদে গান্ধিজীর বক্তৃতা, ১০ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

নিবন্ধটি 'হেমচন্দ্র ঘোষ স্মারক রচনা'রূপে প্রকাশিত হলো।

GNOSIS: Special Issue-4 (Tagore) May, 2019
ISSN 2394-0131; pp. 75-82

Rabindrasangeet and Bishnupur Sangeet Gharana: A Saga of Sodality

Dr. Achintya Mandal

Submitted: 30 March 2019, Revised: 18 April 2019, Accepted: 18 April 2019, Published: 31 May 2019

Abstract: The magnificence of Rabindranath has been universally celebrated and so is of his music. Tagore brought into play the dialectics of his understanding of traditional, classical, contemporary music together with his own music consciousness and modernistic experiments. This resulted into a completely new signature genre-Rabindrasangeet.

Rabindranath was immensely inspired by the Bishnupur Sangeet Gharana. His music carried the marks of this strong influence. The poet himself has acknowledged his gratitude towards the classical singers and teachers of Bishnupur Gharana. He followed the unique tradition of Bishnupur and composed numerous songs under the shadow of Bishnupuri classical music. The eminent singers of this Gharana too associated with Tagore and became an integral part of Tagore's music milieu. This paper would explore the historical facts and significance of the relation between Rabindranath Tagore's music and Bishnupur Sangeet Gharana.

Key words: Rabindrasangeet, Bishnupur Sangeet Gharana, classical music, Radhika Prasad Goswami, raag-raagini.

Rabindranath Tagore grew up at the family house of Jorasanko where an atmosphere of keen indulgence in and sincere cultivation of Hindustani classical music prevailed. Jorasanko Thakur Bari witnessed the expertise of numerous eminent classical singers from different parts of India. Stalwarts from the Bishnupur Sangeet Gharana (a distinguished genre of classical music originated and practiced in Bishnupur, a historical town in West Bengal) were very prominent of them. Bishnu Chakraborty, Sri Kantha Singh, Jadubhatta were the maestros of Raag Sangeet (classical music) and played a major role in building up Tagore's music consciousness, right from his childhood.

From the time of Raja Ram Mohan Roy, Brahmo Samaj, along with the religious activities, developed a strong interest in music. Raja Ram Mohan Roy composed several songs under the influence of Hindustani classical music. Subsequently, Devendranath Tagore had kept this tradition in perspective. Dwijendranath, Satyendranath and Ganendranath had shown great interest in composing Brahmasangeet which were inspired by Hindustani classical music. Eminent musicians like Jadubhatta lived in JorasankoThakurbari. This resulted in the development of a purely musical environment. Tagore's songs were deeply influenced by this childhood association with classical music.

His autobiographical sketches reveal although he himself did not learn classical music formally, the family atmosphere of cultivating this form of music enabled him to compose many of his songs in the Hindustani classical style. He mentions in *Sangeet Chinta* (18) that in spite of having so many eminent practitioners of Hindustani classical music around him, he neither tied the colored thread round his wrist, as was customary for the disciples of classical music, nor allowed his music to get restricted by the strict rules of classical music. Rabindranath imbibed the symphony, the magnificence, the spirit of classical music by simply being a minute listener and later on used it with mastery without abiding by its strictures. The influence of the classical style is manifested in the tunes, words and articulation of his songs. The raags and raaginis heard in his childhood managed to cast long shadows on his songs. But Rabindranath's scepticism about the inflexibility of Hindustani classical music kept him at a distance with it. On the contrary, it is interesting to note that, in the realm of Rabindrasangeet, we find a strong influence of and long standing association with Bishnupur Sangeet Gharana. This paper would further discuss the historical evidences and significance of the sodality between Tagore's music and Bishnupur Gharana.

Though he had not followed a very strict method of learning the classical music, he was the disciple of Sri Jadubhatta (1840- 1883), the famous Pundit of Bishnupur Gharana (Datta1).Jadubhatta was one of the most famous singers of Bishnupur. In fact he was one of the most endowed classical singers of contemporary India. Rabindranath mentions him in *Sangeet Chinta* and writes that he used to sing from the deepest core of his heart and not to show his expertise in dry lifeless grammar bound expressions. Jadubhatta was also the music teacher of Radhikababu. Rabindranath was particularly attracted to Jadubatta's

songs which introduced him to the mesmerizing world of the classical music of Bishnupur Gharana, which eventually emerged as one of the deepest influences on Tagore's music.

After this, one of the famous artists of Bishnupur Gharana, Radhika Prasad Goswami came in contact with Thakur Bari [1861(1863 in different opinion)-1925]. Radhika Prasad was a member of Adi Brahmo Samaj, teacher of the Bharatiya Sangeet Samaj established by Jyotirindra Nath Tagore, as well as the music teacher of JorasankoThakurbari. It is known from *Gitsannasi*Dilipkumar Ray's commentary that Radhika Babu was famous in the whole of Bengal as 'Gosnaiji'(Dey 450). 20th century did not witness a wider renown of any other Dhrupad singer. He had a great collection of *Musalmani* Dhrupad, Khandarbani Dhrupad, Gourharbani dhrupad, Bishnupuri dhrupad and what not. Pandit Bhatkhande was fascinated by the singing of Radhikaprasad as well as his huge collection of music. Radhika Prasad came in contact with Rabindranath in 1888 or 1889. The number of songs written by the bard was about five hundred by then. Radhika Prasad was fascinated by the poet's outstanding talent. On the other hand, the musical proficiency of Radhika Prasad attracted the poet towards classical music. Mutual respect was at a crescendo and gave way to a rich cultural collaboration. Radhika Prasad soon became a much respected figure in Thakurbari. Not only that Radhikaprasad was well versed in Hindustani classical music but also had a rare quality of emancipating music from its restricted renditions (Ghosh 30). This highly complemented Tagore's philosophy of modern music. He wrote in *Sangeet Chinta*, that he was ruthlessly modern about music; he didn't care much about the sanctity of convention. Though he believed that an artist can never disown his tradition, he was never up for blind following or mindless repetition. Tagore found enough hope in Radhika Prasad's music to revive the lost dynamics of Indian music.

As a result of Rabindranath's sincere efforts, Khamkheyali Sabha was established in 1897. Atul Prasad mentions how Radhika Prasad used to entertain them with his mesmerizing performances in Khamkheyali Sabha. Rabindranath's music cognizance was so profound that he used to craft songs in the tunes of Radhika Prasad's BishnupuriClasical music. Radhika Prasad himself used to perform those new songs in the Khamkheyali Sabha. One that Atul Prasad particularly remembered was 'Maharajoekisajeelehridayo puro Majhe' (Sanyal 51).

Every year Jorasanko observed ‘Maghotsov’ which was the biggest festival of the year for them. The main attraction of the festival was music. Preparation of the songs used to start from at least one month ago. Rabindranath used to compose songs on this occasion. Hindi Bhajhans were also composed. Radhika Goswami was the chief singer of the festival, especially for the songs composed under the influence of classical music. A list of songs performed during the Maghotsav of 1898 to 1901 (Bengali 1305 to 1308) was found. There were plenty of Hindi Tappa, Dhrupad, Dhamar based Bengali songs composed by Tagore and evidently those source Hindi songs were collected from Radhika Prasad. This collaboration continued till 1904. Among many such gems produced in joint efforts, mention may be made of the songs such as ‘Bimoloanondejago re’, ‘Pipashahayenahimitilo’, ‘Din furalo hey sansari’, ‘Madhurorupeybirajo’, ‘Chiro sakhachhero na morey’. Radhika Prasad recorded ‘Bimoloanondejago re’ in His Master’s Voice. Apart from this ‘Swapon Jodi bhangile’ and ‘Morey bare barefirale’, these two songs too were also recorded (Sanyal 51-52).

Rabindranath writes in *Pitrismriti*how Amala didi, sister of Chittaranjan Das, inspired his father to compose new songs. When his father recognised the excellent singing abilities of Amala Devi he sent her to Radhika Goswami. The songs which were specifically crafted for Amala Devi were ‘Chiro sakhachheronamorey’, ‘E porobase robe ke’, ‘Ke bosileajhridoyasonebhuboneswarprobhu’. Most probably the tunes of all these songs were taken from Radhika Prasad only (Sanyal 52*)*.

Radhika Prasad had performed almost all the Brahmasangeets composed by Tagore in the Samaj-mandir. He was associated with Brahma Samaj for more than one and a half decade. The credit of providing the sources of numerous Brahmasangeet to the poet can be undoubtedly attributed to him. He was also a great teacher who taught the students with utmost care.

In spite of being a deviant, Rabindranath had deep reverence for Indian classical music. He often reminisced how they used to listen to Dhrupad since childhood. He considered Dhrupad to have maintained a very rich tradition over a deep and wide spectrum. He further elaborated that we find two things in dhrupad- one is its vast expansion and depth and at the other hand a sense of complete submission and compactness and what makes it so appealing is the balance between the two (Sanyal 72). Dhrupad of the Bishnupur genre had maintained its cadence of simplicity without tampering the meaning, mood or spirit

of the songs. This was exactly the point of attraction for the poet. He was so touched by this distinctive feature of this genre that he continued with crafting songs based on the classical songs of Bishnupur Gharana. In this context, many songs can be mentioned: Kaun rupey bane ho (Madhurorupeybirajo), Joyo probolbegboti(joyotobobichitro), Phoolibonoghono mor(Aji momo mono chahe), Aju bohotsugondhopobonmadhurbasanto (Aji bohichhebosontopobon), Agyantomonikoregarhomayipotite (Songshoyotimiromajhe), NachotoTrivongo e (Bipulo Taranga re), Jane Na Dnehu(Rakhorakho re), E Sakhi Aab Kaise (He Sakha momo), Prabala dalameghajhuta (Timiromoyonibironisha) etc. This is how Tagore used these classical compositions as the source songs and trans-created his own versions of timeless pieces.

Bishnupur Gharana had some distinctive features in regard to the *Raag- Raagini* and *Taal* which were quite different from the North Indian classical music Gharanas. For example, in the whole of northern India, *Suddho Rishav* is used in the Ashavari raag, whereas the *Komol Rishav* is used in the Bishnupur Gharana. Although the use of Komol Dhaibat is applied in Purabi raag all over India, in Bishnupur Gharana it is always SuddhoDhoibot. In Brindabani Sarang, in other Gharanas, Suddho Nishad in Aarohan and Komol Nishad in Aborohan is the common practice, but in Bishnupur Gharana only Suddho Nishad is used. In Megh raag only Komol Nishad is used and Gandhar and Dhoibots are excluded in North India whereas in Bishunupur Gharana Suddho Nishad in Aarohan and Suddho Gandhar in Aborohan was used. Though the lesser use of Gandhar often makes it used as the Bibadi Swar. Rabindranath Tagore maintained the exact expressions of Megh raag following Bishnupur Gharana in his songs. The Ramkeli raag is devoid of TibroModhyom in Bishnupur Gharana. All over India Pancham and Komol Dhoibot is used in Basanta raag, but in Bishnupur Gharana Pancham is excluded and SuddhoDhoibot is used. In other traditions, Rishav, Komol Dhoibot and TibroModhyom are used in Bibhash raag but in Bishnupur Gharana all the SuddhoSwars and both the Modhyoms are used. In the other Gharanas, Komol Gandhar and Komol Nishad are used, but in Bishnupur Gharana both the Gandhars and both the Nishads are used. Exclusion of Komol Nishad in Chhayanot and Kori Modhyom in Kamod too are exclusive of this Gharana (Singha Thakur 11).

Tagore accepted these deviations in the best possible way. Tagore's use of Komol Rishav in Ashabori in 'Monomohano, gohonojaminisheshe', exclusion of TibroModhyom in Ramkeli in 'Nikotedekhibotomarekorechibasonamone', and 'Dao he hridayvoredao', use of Komol Nishad in both 'Tomaro asimepran mono loye' and ' Birohomodhuroaaji', inclusion of SuddhoDhoibot in Purabi in 'Aaji e anondosondhya', use of Suddho Dhoibot in Bibhash in 'Aajipronomitomarecholibonath' and 'Ghor dukkhejaginu', use of both Suddho and Komol Nishad in Bhimpoloshri in 'Bipulotorongo re', exclusion of Komol Nishad in Brindabani Sarang in 'Joyo tobobichitroanondo', exclusion of TibroModhyom in Kamod in 'Jotobaralojwalate chai' and 'Amritersagoreamijabo re' and many such instances exemplify how much was he inspired by the style of Bishnupur Gharana and how eloquently he embraced the altered version of Indian classical music (Sanyal 73). He always prioritised the Bishunupur Gharana and followed its unique cadence of raag- raagini and taal.

After the death of Radhika Prasad Goswami, Rabindranath felt a dire need of a music teacher of equal merit. Tagore searched for a suitable classical music teacher for Shantiniketan. He also asked his friends and associates to look for a classical music maestro who could probably grace Shantiniketan with his expertise. He also assigned Dilip Kumar for this task and it was then discovered that in Bengal there is no classical singer greater than Sri GopeswarBandhopadhyay. Rabindranath showed interest in having him as a music teacher but as he was too occupied with his assignments in Kolkata to join Shantiniketan, that wish of Tagore was not fulfilled. Tagore was well aware thatGopeswarBandhopadhyay was the best classical singer of his time. Dilip Kumar too failed to locate anybody better than him. (Singha Thakur 8). Such observations of Tagore delineate what high esteem he had for GopeswarBandhopadhyay.

It is interesting to note that most of the notations of the classical music based Rabindrasangeets were done by the two bright stars of Bishnupur Gharana- Surendranath Bandopadhyay and Ramesh Chandra Bandyopadhyay. Surendranath prepared the entire notations of six volumes of Tagore's*Geetiipi*. Between 1910 and 1918, six volumes of the said book were published. Apart from this, Surendranath had done the notation for most of the songs of the play *Prayoschitto* and more than 250-300 songs by Tagore. It is to be noted that he did the

notations for most of the lyrics of *Gitanjali* and theyhad been published in various volumes of *Geetlipi*. Surendranath recorded 201 Rabindrasangeets through the Visva Bharati Sangeet Bhavan (Sanyal 82).

Tagore's association with Bishnupur Gharana continued till his death. The next person to strengthen the bond between Bishnupuri classical music and Tagore was Ashesh Chandra Bandhopadhyay, the Sangeetacharya of Bishnupur. On 1936, 5 years before his death, Tagore appointed the seventeen years old Ashesh Chandra as the Acharya or principal of Viswabharati Sangeet Bhavan. To be appointed as principal at the age of seventeen in such a prestigious university was indeed a rare incident in the history of music. Tagore associated with Gopeswar Bandhopadhyay through Indira Devi which resulted into Ramprosonno Bandhopadhyay's youngest son Ashesh Chandra's arrival at Shantiniketan as a music teacher. Tagore was overwhelmed to get him at Shantiniketan and was all praises for him. He once wrote to Amita Sen how fascinating it was to him to get Gopeswar Bandhopadhyay's nephew. He certified him to be a marvellous music teacher; according to him though his age was tender his expertise was ripened. Tagore invited Amita Sen to come to Shantinikentan once only to listen to the wonderful singer and also warned her that his singing was so tempting that he might not find any interest in going back to the city to sit for his examinations (Singha Thakur 9).

It is particularly remembered that in the nineteenth century, when the Bengali lyrical music was in the first stage of promotion, especially in the context of Rabindrasangeet, various musicians opposed it. At that time, many singers from Bishnupur Gharana were mocked at for associating with Rabindrasangeet. Stalwarts of Bishnupur Gharana, such as Radhika Prasad Goswami, Acharya Gopeswar Bandyopadhyay, Acharya Surendranath Bandyopadhyay, Ramesh Chandra Bandyopadhyay and others also performed Rabindrasangeets and presented them in various great music concerts (Singha Thakur 9).This contribution of music composers of Bishnupur will be remembered with reverence in the history of music in India.

Works Cited

Dey, Kiransasi. *Rabindrasangeet Susama*. Dey's Publishing, 2014.

Ghosh, Shanti Dev. *Rabindrasangeet.*Viswabharati, 2008.

Paul, Prasanta Kumar. *Rabijibani.* Ananda Publishers, 2007.

Sanyal, Manindranath. *Surer Sadhanay Bishnupur*. Patralekha, 2013. Singha Thakur, Debabrata. *Rabindra Sangite Bishnupur Gharanar Prabhab.*sidho-Kanho-Birsha University, 2017

Tagore, Rabindranath. *Sangeet Chinta*. Viswabharati, 2004.